জলশৃঙ্খল

জলশৃঙ্খল

অপূর্ব কর

পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

মা, নীহারকণা কর ও

বাবা, দেবেন্দ্র মোহন কর

শ্রদ্ধাস্পদেষু

'মুখবন্ধ' লিখতে বসে অনুভব করছি, ভেতরকে তোলপাড় করছে নানা শব্দ; বর্ণ-মালাগুলোর মেজাজ-মর্জিও সব একরকম নয়। ঠিকভাবে ওদের মুক্তির আলোতে আনা অসম্ভব, কলম তাই গুটিয়ে রাখছি।

প্রথম উপন্যাস লিখতে বসার সময় বুকের মধ্যে অনেক নাড়া ছিল, ও'সবের কথাও গুছিয়ে বলব—আমি অপারগ। এ' মুহূর্তে মনে পড়ছে শুধু একটি কবিতা, কবি শঙ্খ ঘোষের কবিতা 'বৃষ্টিধারা'। বইয়ের পটভূমিতে তার অর্থকে দাঁড় করিয়ে কবিতাটি উদ্ধৃত করলাম,—

আমার মেয়েকে নিয়ে বুকজলে/যাবার সময়ে আজ বলে যাব;/
এত দম্ভ কোরো না পৃথিবী/বয়ে গেল ঘরের কাঠামো।/

ঝাপ্‌টা ঝাপ্‌সা করে চোখ/হাহাকার উঠেছে, তা হোক/
রয়ে গেল মাটির প্রতিভা/ফিরে এসে ঠিক বুঝে নেব।/

ভয় দেয় উদাসীন জল/মানুষের স্মৃতিও তরল/
ঘোর রাতে আমাদেরই শুধু/বারে বারে করো ভিতহারা?/

সকলেই আছে বুকজলে/কেউ জানে কেউ বা জানে না/
আমাকে যে সহজে বোঝালে/প্রণাম তোমাকে বৃষ্টিধারা।/

বইটি সকলকে নাড়া দিক; সহৃদয় পাঠকের কাছে অনেক প্রত্যাশায় রইলাম।

কেয়াপাতার নৌকাগুলো ঢলঢল পাট ক্ষেতের ফাঁক-ফোঁকর গলে স্রোতের টানে এগিয়ে চলে দূর দেশে। আকাশ স্নান সেরে এখন পরেছে ফিনফিনে নীল শাড়ি। সবুজের বন্যায় তরতর ভেসে চলা বনটিয়ার ঝাঁক এক সময় ট্যাঁ ট্যাঁ শব্দ করে আকাশের দিকে মেলে দেয় ত্রস্ত-ব্যস্ত ঝটপটানি। একটানা ঘুঘুর স্বর-ও মুহূর্তে থামে, পূবালী ভিটে থেকে ভেসে আসে সমবেত শঙ্খ-ধ্বনি। প্রথমে টেনে টেনে তিনবার, তারপর শাঁখের আওয়াজের পর সুরেলা উলুধ্বনি।

হাতের গোনাগুন্তি নানা খুনসুটির স্মৃতি জড়ানো নৌকাগুলো তখন জলের মধ্যে এদিক-সেদিক ঝটাপট ফেলে ঘোলা জলে দুখানা হাত চটপট ধুয়ে নিয়ে আমরা দেদার ছুট। কারো হাতে বল খেলার বাতাবী লেবু,—সে বুঝি একটু পিছিয়ে পড়ে। কারো কোঁচড়ে ছিল রাশি রাশি কদম ফুল,—ছুটতে ছুটতে গড়িয়ে যায় সে সব ভুঁয়ে। আঁতা-নোনা-ডেঁওয়া কেউ রেখেছিল ইজেরের নীচে, তার চলতে-ছুটতে বড় অসুবিধা। তবু দৌড়—দৌড়। কাদাল জমিতে পা পিছলে যায়, ভেরেণ্ডা গাছে ভূতের মুখের সাদা ফেনা ঝোলে, ওগুলো খেয়াল রাখতে হয় গায়ে যেন না লাগে, পায়ের নীচে ব্যাঙাচির শাদা ধবধবে বাসা মুচ্‌মুচ্‌ ভাঙে, কামিনীর তলায় শাদা চাদর পাতা, চাঁপার গন্ধ নাকে এলেই বাড়ি আর দূর নয়, তারপর লাউ-কুমড়োর মাচা পেরিয়ে গোয়াল ঘরের পেছনে এলেই নাকে আসছে মিষ্টি ধূপ-গুগ্‌গুলের গন্ধ,—ঐ তো মা, মাসি-পিসি, ঠাকুরমা-দিদিমারা ঠাকুর-ঘরের দিকে দাওয়া-মুখ হয়ে সবাই বসে। উদ্ধব কাকা গান শুরু করে দিয়েছেন—

জনম দুঃখিনি আমি দুঃখে গেল কাল
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্মফলে ।

উদ্ধব কাকার গলা কেমন কাঁদো কাঁদো । আমরা চুপচাপ বসে পড়ি তাড়াতাড়ি । সবার দিকে তাকাই । হাত জোড় করে সবাই বসা । সকলের চোখ ছলছল । উদ্ধব কাকা পরিষ্কার গদ্য করে বলেন, যে দেবী নানা সাপে সেজেছেন মনোহরণ বেশে, যেমন সিতালিয়া নাগে কৈল সীতার সিন্দুর/কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর/পদ্মনাগে কৈল দেবীর সুন্দর কিঙ্কিনী/বেতনাগ দিয়া কৈল কাঁকালি বাছুনী ; সেই দেবী কি পাষানী, বাসরে হত্যা করেন চাঁদ-লখীন্দরে । এয়োর সাজ হরণ করেন বেহুলার গা থেকে···· ।

শ্রাবণী আকাশও এ'সময় কাঁদে । পড়ে টপটপ চোখের জলের ফোঁটা । উদ্ধব কাকার সুর তখন খুব ভারী, খুব গম্ভীর, বড় কান্না মাখা । রাঁড়ী বেহুলা মর্মস্পর্শী ভাষায় মরা স্বামীকে বলে—জাগ প্রভু কালিন্দী নিশাচরে/ঘুচাও কপট নিদ্রা ভাসি সাগরে/প্রভুরে তুমি আমি দুইজন/জানে তবে সর্বজন/তুমি তো আমার প্রভু আমি যে তোমার/মড়া প্রভু নও হে তুমি, তুমি যে আমার গলার হার···· ।

বিকেলের শেষ রোদে কখন যেন পাক ধরে যায় । মাঠের শেষ সীমানায় ধর্মবট গাছ । তার অনেক পেছন দিয়ে বয়ে যায় এক নদী । তার ওধারে ঝুকে পড়েছে নীরব পশ্চিম আকাশ । এক সময় বুঝি সেখানে চিতা সাজানো হয় । আগুনের লালিমায় রাঙা হয়ে ওঠে মরা দিনের লাশ । পোড়ার আগে তার এলোকেশি চুল সন্ধ্যার বাতাসে থেকে থেকে হু হু কাঁপে ।

উদ্ধব কাকার সঙ্গে অন্যতম ঘন্ত্রী নিবারণদা । বড়-ছোট সকলের

দাদা উনি। বেহালা হাতে নিলে ঝাঁকড়া চুলে নিবারণদা চোখ-বোজা। পালা শেষতক্ ধ্যান মগ্ন ভিন্ন মানুষ। গাঙ্গুরের জল কেটে মরা স্বামীর দেহ উরুতে শুইয়ে বেহুলার মান্দাস এগিয়ে চলে সুর-পুরে। উদ্ধব কাকা তখন সত্যি সত্যি কাঁদেন। নিবারণদা কিছুক্ষণ বাজানোর একা সুযোগ পান। বাদল বাতাসে তার ছড়ে কাঁদে সিন্ধু-বাঁরোয়া।

কখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নামে। ঘুম চোখে কানে আসে উদ্ধব কাকা বলছেন—

চৌদিকে মেঘের সাজ ঘোর অন্ধকার।
ঘন ঘন বজ্রাঘাত বিজলী সঞ্চার॥
মুষল প্রমাণ ফোঁটা ঘন বরিষণ।
শিলাবৃষ্টি ঝাঁকে ঝাঁকে হয় ঘন ঘন॥

ঘুমে ঘুমে আমরা তখন চলে গেছি অজানা দেশে। তলিয়ে যাচ্ছি ঘুম-সায়রে। সেখানে কি মিষ্টি অন্ধকার॥

(দুই)

শিয়ালদা ষ্টেশন তখন এ রকম ছিল না।
মহা প্লাবনে চারদিকে সব কিছু তলিয়ে গেছে, মাথা তুলে জেগে আছে একটা উঁচু ডাঙা।

যেমন মরিয়া হয়ে বানভাসি জীবজগৎ প্রাণপনে এগোতে চায় এতটুকু আশ্রয়ের সন্ধানে, চায় খড়কুটোও আঁকড়ে ধরতে, এক শ্রাবণ দিনে ভিন্ন এক প্লাবনে বিপর্যস্ত মানুষ।

ধানরঙা ইষ্ট পাকিস্তান মেল—, নোয়ার নৌকা এসে ভিড়ছে শিয়ালদার ঘাটে। নৌকা একটা নয়, এ মহা প্লাবনে ভয়াল জল কেটে কেটে অগুন্তি নৌকা। কোন জিনিস মাটি থেকে ক্ষিপ্রহাতে তুলে আরো দ্রুততরভাবে অন্য কোথাও ছুড়ে

দেওয়া, ভয়সঙ্কুল এক আস্তানা থেকে গতির শেকল কয়েক লাফে পার হওয়া, হাঁপাতে হাঁপাতে মোটামুটি এমন এক জায়গায় পৌছানো যার আরেক নাম স্বস্তি, যে উপায়টুকুতে সেখানে আসতে পারার সুযোগ তারই নাম বুঝি সেদিন ছিল ইস্ট-পাকিস্তান মেল।

সাল ১৯৪৭। থৈ থৈ বাংলাদেশ এক ভয়ঙ্কর প্লাবনে। আদিম পৃথিবীর সাজ পরা দানব আকাশ—অত্যাচারী হাতের অস্ত্র এমনি সময় যেমন রেখে দেয় আড়ালে, তা ব্যবহার করার সময় অন্ধকারে রাখা অস্ত্রের আধার খুলতে হয়, আধারে জড়ানো অন্ধকার-রঙ সে মুহূর্তে মুক্তির উন্মত্ত উল্লাসে ভয়ঙ্কর দাপাদাপিময়, কালবিষ ছড়িয়ে দিচ্ছে তখন আকাশ তেমনি অঝরভাবে। নিকষ কালো পাথর গলে গলে বিভৎসতা হয়ে বইছে। মেঘের বুক থেকে ঢল করাল স্রোতের।

মেঘ জমছিল আকাশে বহুদিন থেকে। কুটিল আলখাল্লা পরা দারুণ মেঘ। তার প্রতিটি জলকণায় করাল বিষ। কোথায় এ মেঘের জন্ম ? কোন্ গহন কান্তারে ? কোন্ ভয়াল গুহায় ? কোন্ লোমশ সাগরে তার জন্মের ভ্রুণ ? একদিন ভ্রুণ ফাটে। লক্ষ-কোটি নাগিনীর অবধারিত জন্ম।

স্পষ্ট মনে আছে, শ্রাবণ মাসে পূবালী ভিটায় অষ্ট-মঙ্গলা ভাসানের গানে সুখ-শান্তির অনন্য ভুবন যখন বেশ মগ্ন, বাবা একদিন দুপুরে আচমকা শহর থেকে বাড়ি ফিরলেন।

এ কী চেহারা হয়েছে বাবার ! প্রাণোচ্ছল মানুষটি এত বদলিয়ে গেছেন ! চোখের কোণে কালি, মাথার চুল উড়ছে চৈত্রের পোড়া শরবন। দানোয় পাওয়া ভাব-ভঙ্গী, চোখ উদাস জ্যৈষ্ঠের মাঠ। ঝড়-তুফান ঠেলে, পেরিয়ে দুরন্ত হাজার নোনা ঢেউ, বিধ্বস্ত সমুদ্র-যাত্রা থেকে উঠে এসেছে ক্লান্ত অবসন্ন নিভু নিভু এক আলোর শিখা : বাবা,—মনসা-ভাসানের যেন চাঁদ সদাগর। কখন তার তলিয়ে

গেছে সপ্তডিঙা মধুকর—আর তার দুরন্ত বাণিজ্য-যাত্রার ইতিহাস। ক্রমে স্পষ্ট থেকে স্পষ্ট, বাবার অসময়ে বাড়ি ফেরার কারণ।

"...অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ছুটছে চৌষট্টি ডাউন ইস্ট পাকিস্তান মেল। তার চিমনি থেকে বেরোনো কালো ধোয়া দুর্বৃত্ত রাতের মতো তত কালো নয়। তার হুইসেল বাজছে করুন আর্তনাদ, কসাই চিরেছে বুক। ব্যথার শব্দ তরল পারার মতো ভারী।..."

সাবেক কালের তেলরঙা ছবি দেওয়ালে ঝুলে আছে—বোবা ইতিহাস,—স্মৃতির সামনে দাঁড়াই। যেন কাল রাতে অমাবস্যা ছিল। সভ্যতাকে কালি লেপে বানানো হয়েছে কালীমূর্তি। গতকাল মন্দিরে সে করালী দেবীর পুজো সাঙ্গ হল। মন্দিরের পাশ দিয়ে বহমান এক নদী, নদীতে নেমেছে মন্দির থেকে শ্বেতশুভ্র সিঁড়ি। আজ শাদা পাথরের ঘাটের সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে গলগল রক্ত—কাল রাতে মন্দিরে লক্ষ বলির সাক্ষর।

অথবা বাজছে কাড়ানাকাড়া, দুন্দুভি। বনের মধ্যে সভ্যতা করুনাঘন এক পাথরের স্তব্ধ মূর্তি। অসহায় এক হরিণ-হরিণী প্রাণভয়ে আশ্রয় নিয়েছে তার আড়ালে। অরণ্যের নিস্তব্ধতা খানখান করে দ্রুত এগিয়ে আসছে বিভৎস কোলাহলের ঝড়। খোলা অস্ত্র হাতে এগিয়ে আসছে ব্যাধের দল। উল্লাস আকাশভেদী। অট্টহাস তীক্ষ্ণ অস্ত্রের থেকেও ধারালো। একসময় দমকা বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দ। বুক এফোঁড়-ওফোঁড় হরিণ-হরিণীর।

ছেঁড়া-খোঁড়া একটা মানুষ টলতে টলতে এসে দাঁড়ায় শিয়ালদহ ষ্টেশনে। 'এক' কথাটা নিয়ে এখানে নানাভাবে নাড়াচড়া অনায়াসেই সম্ভব। একটা মানুষকে যদি ভাবি ফায়ারিং স্কোয়াডের মুখোমুখী হওয়া ইতিহাস,—যদি একটা মানুষকে কল্পনা করি মানুষের বিরাট সমুদ্র,—যদি ভাবি একটা মানুষের সংখ্যা এখানে গৌন, দানব ছিঁড়ে-

কুরে খেয়েছে লাখো জীবন,—একটা মানুষ একটা জাতি, তাকে নিয়ে সুচতুর এক জুয়ারীর দলের ভয়ঙ্কর অক্ষক্রীড়া, যদি ভাবি একটা মানুষ 'অসহায়তা' শব্দের জীবন্ত মূর্তি,—একটা মানুষ জলপাই রঙা ইস্ট-পাকিস্তান রেলের একটা বোবা ট্রেন—মহা প্লাবন ঠেলে ঠেলে অবশেষে এসে উঠেছে উঁচু চড়ায়। সপসপ, ভিজে গা।

.......কোথায় এক বাউলের সুর কাঁদছে—শিয়ালদহ-গোয়ালন্দ আজো আছে ভাই, আমি যামু আমার বাড়ি সোজা রাস্তা নাই।...
ঝেঁপে বৃষ্টি নামল—বুক থেকে টপটপ রক্ত।...

রহিমকাকা আমার শৈশবের প্রিয় মানুষ, আমার পাঠশালা জীবনের মাষ্টার মশাই। টলটল রোদের অফুরান ভাণ্ডার তার বুক। দারুনভাবে আমাদের আগলে রাখতে চেয়েছিলেন তিনি। বাবাকে বলেছিলেন—হেরা কইল, আর আকাশ ভাগ? আমি-তুই আলাদা হইয়া গেলাম? বাপ-চৌদ্দ পুরুষের ভিটা মাটি ছাইড়া রওনা পাড়লি?

বাবা বুঝিয়েছিলেন তাকে—সাত-পুরুষের ভিটে মাটি ছাড়ায় যে কি দাগা, তুই বুঝবি না। কিন্তু বিষ-গাছ যে লাগানো হল, যত গাছ শেকড়ে যাবে, ডালপালা মেলবে, ফুলে-ফলে ভরবে, দেখবি এর কি দারুন পরিণতি। চতুর যাদুকর এবার বেশ গুছিয়েই জাল ফেলেছে রে........।

বাড়ি থেকে সপরিবারে বেরিয়ে আর তিনি পেছনে তাকান নি। আমাদেরও নিষেধ করেছিলেন। ভারী গলায় বলেছিলেন—শ্মশান ছেড়ে বেরিয়ে আর শ্মশানের দিকে তাকাতে নেই।

রহিম কাকা হাউ হাউ করে শিশুর মতো কেঁদে বলেছিলেন—স্বাধীনতা পাইলাম? বেবাক কিছু ভাগ....। যদ্দিন এই দ্যাশে মাস-বচ্ছর থাকব, এই আগস্ট মাস আইলেই ইতিহাসের সব কথা মনে পড়ব। আমাগো কান্নার জল লইয়া ঝরব পানির মাস,—বর্ষা ঋতু।....

(তিন)

বাবা মূর্ত এক ট্রাজেডি। স্বপ্ন দেখা, স্বপ্ন ভাঙার সমষ্টি—বাবা। এক গূঢ় ষড়যন্ত্রে সবাই হেরে গেলেন।

সবাই মিলে একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন। প্রত্যেকের বুকে ইজেল ছিল, অনেক রঙ, সুঠাম তুলি। সব জায়গা ওঁনারা ভেবেছিলেন চিত্তিরে ভরিয়ে দেবেন।

....পৃথিবী তো একটা আর্ট গ্যালারিই। ওরা চেয়েছিলেন দিনগুলোকে, প্রতিটি মুহূর্ত, সময়কে অপূর্ব রঙে রাঙিয়ে দিতে। সব আলো শুষে গিয়ে কালো নয়, শাদাও নয়, ওদের মন-পসন্দ রঙ ছিল অনেক রঙের জীবন্ত সম্ভার।

বাবার গোটা জীবন এক নূতন চারাগাছকে বাঁচিয়ে রাখার সাধনার ইতিহাস। ডিকশনারির 'আত্মত্যাগ' শব্দ বুঝি ওঁদের দেখেই সৃষ্ট। ব্রিটিশের আইন অমান্য করেছিলেন। কারান্তরালে গেছেন বহুবার। ভাড়াটে সৈন্য ছিলেন না ওঁনারা। প্রতিটি বুক স্বপ্ন-কলি। প্রতিটি কাজে শত্রুর উদ্দেশ্যে ওদের ঘোষণা ছিল—'নো পাসারন'।

হেরে গেলেন ওঁনারা। আশ্চর্য ভাবে ওঁরা দেখলেন একদিন স্বপ্নের পতাকা পুড়ে যাচ্ছে। তছ্‌নছ্‌ বুকের কুমোরপাড়া। সব মূর্তিগুলোকে গ্রাস করে নিচ্ছে ধোয়া অন্ধকার। বিধ্বস্ত বাগানে দাঁড়ানো চাঁদ সদাগর ; মহাজ্ঞান মন্ত্র নেই, হেন্তালের লাঠি চুরি করে নিয়ে গেছে মায়াবী ইতিহাস, সখা ধন্বন্তরী ওঝা—ডাকাবুকো সাহস না, সেও নেই, মরে গেছে কবে গূঢ় ষড়যন্ত্রে।

জীবন সন্ধ্যায় পশ্চিমের সূর্যাস্তের দিকে বাবা নিথর হয়ে চেয়ে থাকতেন। ভোরের লাল আকাশের দিকেও তাকিয়ে থাকতে থাকতে কখনো উচ্চারণ করতেন,—তখন প্রত্যুষ। উপনিষদের উদাত্ত মন্ত্র বাতাসে গাম্ভীর্য নিয়ে হেঁটে যেত,—যেন হেঁটে যাচ্ছে সৌম্যকান্তি এক

আশ্রমিক। ভোরের সূর্যের কাছে নম্র প্রার্থণা—অসুনীতে পুনরস্মাসু চক্ষুঃ/পুনঃ প্রাণমিহনো ধেহি ভোগম্. ।/জ্যোক্ পশ্যেম সূর্যমুচ্চরন্তম্. অনুমতে মৃড়য়া নঃ স্বস্তি।—হে প্রাণের নেতা, আমাকে আবার চোখ দিও, প্রাণ দিও, আমি উচ্চরন্ত সূর্যকে সবসময় দেখব, আমায় তুমি স্বস্তি দিও।

বাবার শেষ জীবনের প্রিয় গান—'সার্থক জনম মাগো জন্মেছি এই দেশে.... ।'

এত সত্ত্বেও বুঝতে দেন নি ওঁনারা হেরে গেছেন। বলতেন, বৈনতেয়রা রইল, কদ্রুর ষড়যন্ত্র একদিন প্রকাশ হবে।—দেন এ্যান ওয়াণ্ডারফুল ফ্লাড অন আর্থ,—নট দি ফ্লাড অব টিয়ার্স—ডিলাইটফুল সান রে এভরি হোএয়ার.... । বলেছিলেন, শেষ হিসাব দেখা পর্যন্ত জেগে থাকবেন ওঁনারা।

*　　　　*　　　　*　　　　*

দেশ ভাগ ও খণ্ড স্বাধীনতা দেওয়ার পেছনে কুটিল সভ্যতার যে গূঢ় ষড়যন্ত্র তা হার মেনেছে আরেক জায়গায়। মেলে নি কালনেমীর হিসাব।

নিদারুন ব্যথার আগুন বুকে শুষে নিয়েও ভুবনবাবুরা হারিয়ে দিয়েছেন দুঃশাসনের গুটি সাজানো ভূতুড়ে এক পাশা।

লাখে লাখে মানুষ আসছেন এপারে, ছিন্নমূল মানুষের অনন্ত স্রোত। এক একজন মানুষ মানেই দাউদাউ এক সমস্যা। জলন্ত বা বিপন্ন কোন কিছুর সংস্রবে বুঝি সব কিছুর আশঙ্কা থাকে সে রকমই হওয়ার।

ভুবনবাবুরা চোখের সামনে দেখছেন হারিয়ে যাচ্ছে আজন্মের চোখে দেখা অতি পরিচিত পৃথিবী। ধূসর হয়ে আসছে জমি-জমা, প্রভাব-প্রতিপত্তি, এমন কী লুপ্ত প্রায় মান-সম্ভ্রম-অধিকার। নিজ দেশে পরবাসী।

সাম্রাজ্যবাদীদের জাবদা খাতায় টোকা ছিল অন্য হিসাব। বিপন্ন মানুষের দল মুখোমুখি হবে আরেক আত্মজ-ধ্বংসলীলায়। পরস্পরে মেতে উঠবে ঘরের মধ্যে ঘরে আরেক মহাবিবাদে। পরিণতি....

না এবার মিললো না হিসাব। বাজিকর প্রাণান্ত হয়ে যদিও বাজালো উন্মত্ত ডুগডুগি। ব্যর্থ বাজিকর, এবার ব্যর্থ তার চতুর মারণ-খেলা।

ভুবনবাবুকে আমি ডাকতাম জ্যেঠা মশাই বলে। ট্র্যানজিট ক্যাম্পে আমরা যখন কতগুলি গোণাগুন্তি সংখ্যা, আমাদের পরিচয়ে আয়ারল্যাণ্ডের উদ্বাস্তুর সখ্যতা, কিংবা নামগোত্রে আমরা ভিয়েতনামের শরণার্থী, আরব দুনিয়ায় নিরন্তর ঘর খোঁজা হতভাগ্য প্যালেস্টাইন-বাসীর দল,—একই নাম-গোত্র নিয়ে ছুটছি আমরা কোরিয়ান, ছুটছি ভিয়েতনামী, শ্রীলঙ্কা, ব্রহ্ম থেকে উৎপাটিত মানুষ—ছিন্নমূলের দল, পেছনে চলে যায় লেবানন সীমান্ত,—তুরস্ক, গ্রীস, মরোক্কো, টিউনিসিয়া, খণ্ডিত জার্মানীর মাঝে কাঁটাতার, আইরিশ, সমুদ্রের তীরে আকাশ ভাগ, যখন অভিশাপ দারুন এক তকমা এঁটে দিয়েছে আমাদের পরিচয়ে—ভুবনজ্যেঠু সেদিন আমাদের আশ্রয় দিয়েছিলেন নিজেরি খাসবাড়িতে।

নীলকণ্ঠ সে মানুষটির সামগ্রিক অস্তিত্বে যখন অপরাহ্নের নম্র রোদ, কতদিন আমি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি তার দিকে। এক সময় জমি-জমা ছিল। দান-খয়রাতে দিন কেটেছে একদিন মহিমান্বিত গরিমায়। আজ এক ছেলের আয়ের উপর দশ-এগারো জনের সংসার, দু' দুটি শিক্ষিত ছেলে চাকরীর জন্য হন্যে হওয়া, ঘরে দুটি অনূঢ়া মেয়ে।

........পাঞ্জাবের উদ্বাস্তুর মতো আমরা কিছুই পাই নি, তবু বুঝি কিছু পেয়েছি। কিন্তু ভুবনবাবু—ভুবনবাবুরা? কি পেয়েছেন তারা? সব হারানোর রিক্ততা তাদের-ও তো গ্রাস করেছিল!........

মাঝে মাঝে নিজেকে আমি কি রকম অপরাধী ভাবতাম। আচ্ছা, আমাদের যদি এখানে আসতে না হত, সুজয়, অজয় ভুবনবাবুর ঐ বেকার ছেলেরা নিশ্চই কর্মহীন থাকতো না ; এখানেও তো মাঠে মাঠে ফলত সোনার ফসল, শান্তি-সোয়াস্তির ছিল ঘর ও উঠোন ; অভাব-অভিযোগ-হাহাকারের ছিল না তেমন কায়েমী রাজ্যপাট। আমার—আমাদের জন্য আজ তাদের ক্ষুধার অন্নে টান পড়েছে। ফসলের ক্ষেতে আজ থিকথিক জনবসতি। চাকরীর বাজারে আমি-অজয়-সুজয় প্রতিদ্বন্দ্বী। একই হাঁড়ির চারপাশে পাত পেতে বসে আছি এক দঙ্গল নিরন্ন কাঙাল। সুখের সংসারে তাদের ছুঁয়েছি আমাদের পোড়া-আডরা জীবনের জ্বলন্ত পাবক শিখা ...... !

আমি জানি, জন্মভূমির আজ একটা বারোয়ারি পূজা কমিটিতেও ভুবনবাবুর ডাক পড়ে না। তবু তার বুকে আমি দেখি শারদ দিনের আদিগন্ত চেয়ে থাকা নীলাকাশ, সেখানে বাজপাখি বা চিলের রঙের একটুকরো মেঘের দানাও ওড়ে না, আমি দূর থেকে স্পষ্ট টের পাই সেখানে সারাবেলা টুপটুপ ঝরে পড়ে শিউলি ফুল।

—ভুবন জ্যেঠুর বুক কি অপরূপ উঠোন !

(চার)

জগমোহন ঘোষালের মাথার মধ্যে একটি কবিতার লাইন কেমন যেন সরেস জমিতে আচমকা ছিটকে পড়া ফসলের একটা পুষ্ট বীজ এসে একদিন খাসা গেঁথে গিয়েছিল—যেখানেই দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন.... ।

গলির মোড়েই ইমারতী সবরকম জিনিষ অহোরাত্র সরবরাহের ফুস্‌মন্তর ভরা জগমোহনী সাম্রাজ্য। কি সরবরাহ করেন না জগমোহন বাবু ? জমির তত্ত্ব-তালাশ থেকে মায় কোন বিক্রয়যোগ্য

বাড়ি বা জমির কে মালিক, কয় শরিক, কে কোথায় থাকেন, কি করেন, কেন সম্পত্তি বেচছেন, সব হদিশ জগমোহনবাবুর একেবারে বুকের নোটবুকে সবসময় হাজিরস্থ। জমি কেনা-বেচাব সব রকম সাহায্য থেকে ঘর বানানোর যাবতীয় যা কিছু সরবরাহ, এমনকি ঘর বানিয়ে, ঠাকুর চাকর দিয়ে গৃহ-প্রবেশের নিখুঁত অনুষ্ঠান সব কিছু নিঝঞ্ঝাটে সেরে দিতে জগমোহনবাবু দেবপুরীর বিশ্বকর্মা বা মহাভারতের ময়দানব।

মানুষটির আশ্চর্য গুণও আছে বলতে হবে। টাকার কুমীর, তিমি বা হাঙ্গর হলেও থাকেন একদম সাধাসিধে। মোটা কাপড়ের ফতুয়া গায়, হাঁটুর একটু নীচে সাধারণ ধুতী, বিলাস বলতে পায়ে অর্ডারি দামী পাম্পসু, গলায় আছে লাল বড় রুদ্রাক্ষের মালা। কথা-বার্তায় নেই কোন ঢাক-গুড়গুড়ানি। অকপটে স্বীকার করেন—দেখুন বিজনেস ইজ বিজনেস। মাথা খাটিয়ে কারবার করো, তাই বলে বিজনেস করতে গেলেই ফোর-টুয়ান্টি করতে হবে তা হল ঘোর অন্যায়।···· বুঝলেন ঐ চারশ-বিশী ব্যাপারটা ব্রিটিশই আমাদের শিখিয়ে গেছে···।

আমার সহকর্মী অতীশ, পুরোনো ইতিহাসের পারঙ্গম অধ্যাপক, মুখে অনেকটা বিস্ময় নিয়ে প্রশ্ন করে—সততা করে আজকাল ব্যবসা হয়?

—ঐ তো কথা হয়েছে মশাই, আজকালের। সততা না থাকাটাই হয়ে যাচ্ছে আজকের মর্ডানিজম। দায়ী মশাই ঐ ব্রিটিশ····। জগমোহনবাবু স্মৃতিচারণ করেন—ব্রিটিশ এসে কি না করেছে আমাদের? লাভ কি অলাভ সে সব ব্যাপার নিয়ে মাথার চুল পাকাবেন আপনারা। আমি মশাই, বিদ্যে-বুদ্ধি অর্জন করি নি এতটুকু? তবে একটা কথা মাঝে মাঝে খুব খটকা লাগায়, বলি, ঐ বিদেশীরা না এলে কি আমাদের উন্নতি-টুন্নতি সব আটকে থাকত!

ও কথাটা কি একটু-ও সত্যি ? কেন, আমাদের এ' দেশটায় সারাসার কি কিছু ছিল না নাকি ?…

জগমোহনবাবুর গলার স্বরে ইতিমধ্যে ফেটে পড়ে খরতাপ। গলায় ঝাঁঝ নিয়ে বলেন—ব্যবসার দফা-রফা করেছে ঐ বিদেশী বেনিয়ারা, বুঝলেন মশাই, ব্যবসার সতী-লক্ষীকে অসতী করেছে ওরাই। ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল সুন্দর একটা ফুল-ফুলন্ত চারাগাছ, ওটাকে শুঁয়ো-পোকার মতো তিল তিল করে ঝরঝর্ করে কেটেছে ওরা।

জমি-জমা কেনা-কাটা ও তারপর গড়ে তোলা একটা ভদ্রাসন, এ'সব নিয়েই তখন প্রায়শই জগমোহনবাবুর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকার ও সেইসূত্রে মাঝে-মধ্যে জোর বৈঠক।

অতীশের একে নবীন বয়স। উদ্যমী অধ্যাপক। গবেষণারত থাকায় মস্তিষ্ক কামারশালা থেকে সদ্য বেরিয়ে আসা নানা প্রশ্ন যেন ঝলমলে তলোয়ার। প্রথম দিন থেকেই জগমোহনবাবুকে ওর ভালো লেগে গিয়েছিল খুব। বলেছিল—গল্প করে আরাম পাওয়া যায়, চমৎকার এক গাইড বুক।

লক্ষ্য করছিলাম জগমোহনবাবুর কথা-বার্তার প্রতিক্রিয়ায় ওর মধ্যে একটা উসখুস্ ভাব। নূতন কোন বই পড়েছে হয়তো সদ্য সদ্য। জগমোহনবাবুকে তার সঙ্গে মেলানোর আগ্রহ। যা ভেবেছি ঠিক তাই, মুখ খুলতেই জিজ্ঞেস করলাম—কাউকে কোট করবে মনে হচ্ছে। তা, কে বলো …।

মুগ্ধ হাসি হেসে সে গড়গড় করে বলতে থাকে। কোন বিষয় মিলিয়ে প্রাসঙ্গিক কারো বই থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া ওর একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য। চোখের দিকে তাকিয়ে অতীশ বলতে থাকে,—জগমোহন বাবু যে রকম বললেন হিস্টোরিয়ান 'কি' 'ক্রাইষ্ট ইন ইণ্ডিয়া'য়—য়ুরোপীয় বণিকদের সম্বন্ধে সেরকমই বলেছেন,…

"From the moment of their landing on the

shores of India the first settlers cast off all those bonds which had restrained them in their native villages; they regarded themselves as privileged being—privileged to violate all the obligations of religion and morality, and to outrage all the decencies of life. They who went thither were often desperate adventurers, who sought those golden sands of the East to repair their broken fortunes; to bury in oblivion a sullied name; or to wring with lawless hand, from the weak and unsuspecting, that wealth which they had not the character or capacity to obtain by honest industry at home. They cheated, they gambled, they drank, they revelled in all kinds of debauchery".

জগমোহনবাবুর জন্য সে এরপর উক্তির বাংলা তর্জমা শোনায়,—অর্থাৎ প্রথম ঔপনিবেশিকরা ভারতের মাটিতে যেই না পা ফেলল, বাস, সেই মুহূর্তেই যত বাঁধন-টাঁধনে ওরা স্বদেশে বদ্ধ ছিল তা অনায়াসেই ঝেড়ে ফেলল। নিজেদের দেশে যে সব পিছুটানে তাদের মধ্যে সংযম দেখানোর একটু-আধটু ব্যাপার-ট্যাপার থাকতো, তাকে এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে নিমেষে ওরা গোল্লায় পাঠাল। কে মানে ওসব আদিখ্যেতা! এক একজন নিজেদের মনে করতে লাগল, আমি কি হনু রে। চুলোয় যাক যতসব ঐ ধর্ম ও নীতি-রীতি। নির্বাসনে পাঠাল সভ্যতাকে। এ দেশের মাটি-ধুলোও যে সোনার বারা, কুঁড়িয়ে নিয়ে ফেরাতে হবে যার যার ফুঁটো-ফাঁটা কপাল আছে। দেশে থাকতে যে নাম-গোত্রের উপর জমেছিল কলঙ্কের ধুলো-ময়লা তা ঘুচিয়ে ফেলার হাতে এসেছে খাসা সুযোগ। ন্যায়ের

পথে হেঁটে চলে, চরিত্রের ক্ষমতায় বা খাটা-খাটুনি করে দেশে থেকে একটা পয়সাও সৎভাবে যারা উপার্জন করতে পারে নি, এদেশের দুর্বল এবং অসন্দিগ্ধ মানুষের কাছ থেকে যত রকম অবৈধ উপায় আছে তা দিয়ে সব কিছু কেড়ে নিতে হবে। এখানে আসাতক ওদের জীবনের মোদ্দা কথা, যাকে যে ভাবে পার ঠকাও, জুয়া খেল, মদ খাও, ফূর্তি-ফার্তা কর, মানে মানে লুটে-পুটে খাও, কি জানি এমন সফল মানব জীবন, মিলবে কি আর এ ধরায় বা কপালে.... !

জগমোহনবাবু তাল ঠুকে বলেন—নিজের চক্ষে দেখেছি মশাই, যুদ্ধের বাজারে তেঁতুল গাছ হয়ে গেল শাল-কাঠ ; পুকুর, ডোবা, সরোবর চুরি কি মশাই, নদী, সমুদ্র, একেবারে মহাসাগর চুরি। একটু দম নিয়ে বলেন, গলার স্বরে অকপট আন্তরিকতা,—ভাবছেন আমি তখন কি করেছিলাম ? এই ঠাকুরের মালা ছুঁয়ে বলছি মশাই, এক বর্ণও মিথ্যে বলবো না, বিশ্বাস করবেন কি না জানি না, প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—স্রেফ সততার উপর নির্ভর করে বিজনেস করব, করে দেখাব। শুধু স্কিল, মাথা-খাটানো মশাই, হাতিয়ার ঐ মাস্-কনট্রাকট—জন-সংযোগ। বিস্তর ছুটোছুটি করতাম, তের জায়গায় ঘুরে চৌদ্দ রকম খবরাখবর নেওয়া। তারপর সে সব যোগাড় করা, ন্যায্য লাভ রেখে তা যোগান দেওয়া। অতিরিক্ত যেমন লোভ করি নি, আবার বাবুয়ানা ! না মশাই, ওটি আমার একটুকুও পছন্দ নয়, পয়সা জমেছে সম্পত্তি বাড়িয়েছি, তাও করেছি বংশধরদের কথা ভেবে.... ।

আমি আচমকা জিজ্ঞাসা করি—তা করতে গিয়ে কোন অন্যায়.... ?

প্রয়োজনের অতিরিক্ত সঞ্চয় করাকে যদি অন্যায় বলেন, তা হলে বলতে পারেন, করেছি। তবে মশাই জ্ঞানত....

অতীশ প্রশ্ন করে—আফটার অল্ সব সময় যখন একটা অসম প্রতিযোগিতা, মানে বিজনেস ওয়ার্ল্ডে অন্তত যেখানে একদিকে

'ভ্যালুজ' আরেকদিকে যত 'ডিভ্যালুজ', সেখানে সুস্থভাবে টেকা, 'থ্রাইভ' বা 'ফ্লারিশ' করা ..., কি—ভাবে পারলেন ?

একটু সময় নিয়ে এবার জগমোহনবাবু বলে চলেন—যদি ঠিক জানতে চান পারি নি হয়তো। ঐ যে-কথা বলছিলাম, ব্রিটিশ ভেঙে দিয়ে গেছে আমাদের 'মরালিটি'। ধ্বংস করে দিয়ে গেছে পাপ-পুণ্যবোধ। লোভ. স্বার্থচিন্তাকে প্রবেশ করিয়ে দিয়ে গেছে রক্তে-মাংসে এমনভাবে যে, যা কিছু অন্যায় যা কিছু অসৎ, যা কিছু ঘৃণা, লজ্জার, ধিক্কারের তাকেও আমরা আজ তা বলতে নারাজ। আমার বংশধরদের চোখে গঙ্গার মাটির রঙ যেহেতু সিমেন্টের মতো, অতএব ওটাকেও বিক্রি করা যায় সিমেন্ট হিসেবে, শেয়াল-কাঁটা পিষলে যা বেরোয় তা-ও কেন নয় সরষের তেল ? প্যাকে পুরে অবিকল দেখতে যে ট্যাবলেট তাও মরণ-বাঁচনে খাওয়ানো যায় মূল্যবান ট্যাবলেট বলে। কি এলো গেল আমার বাড়ি বা সেতু ধ্বসে গেলে, হাজার হাজার মানুষ অন্ধ, পঙ্গু বা তিলে তিলে মরে গেলে ? যে রোগী মরল সে আমার কে ?

জগমোহনবাবুই গলায় অপেক্ষাকৃত আবেগ নিয়ে এক সময় সরাসরি আমাদের দিকে প্রশ্ন তোলেন—বলুন তো এখানে আমাদের কারো মনে একবারও এই প্রশ্ন জাগে, এই খাদ্যে-ঔষধে ভেজাল মেশাচ্ছি, চরম অন্যায় করছি, এ খাদ্য বা ঔষুধ তো ব্যবহার করতে হবে আমাদেরই : হয়তো—আমাকে ? 'আমিই তো তবে নিজের হত্যাকারী ! বিবেক বা এসব প্রশ্ন আমাদের মধ্যে জাগে কি, বলুন।

অতীশ জগমোহনবাবুর চরমবোধকে ধরতে চায়। প্রশ্ন করে—এর জন্য দায়ী করবেন কাকে জগমোহনবাবু ?

রুদ্রাক্ষের মালা গলায় জড়ানো ত্রি-সন্ধ্যা সন্ধ্যা-আহ্নিক করা মানুষটি কি উত্তর দিতে পারেন অনুমান করি। হয়তো হাত দিয়ে দেখাবেন কপাল, বলবেন দায়ী ভাগ্য। দেওয়ালে টাঙানো দেব-দেবীর

ফটোর দিকে তাকিয়ে ভক্তি-নম্র ভঙ্গীতে বলবেন—হবে না কেন অনাচার? দেব-দ্বিজে ভক্তি আছে আমাদের! না হয় যেরকমটি আগে তিনি বলেছেন, দোষ দেবেন ঐ ব্রিটিশকে....

অবাক আমি ও অতীশ। হয়তো এ মুহূর্তে বাকহারা। মানুষটার সম্বন্ধে আঁকা ছিল ধারণার ফ্রেমে অন্যরকম ছবি।

বড় বেদনা ঝরে পড়ে জগমোহনবাবুর কথায়—রবি ঠাকুরের 'রাশিয়ার চিঠি' তো পড়েছেন? ঐ লাইনগুলো মনে করুন...। (স্তম্ভিত হই—ঠিক ঠিক উদ্ধৃতি। কি প্রখর স্মৃতি! একেবারে হতবাক। মানুষটাকে সত্যিকথা বলতে কি ভেবেছিলাম একটা কাট-খোট্টা নিদেন মানুষ। বিদ্যা-বুদ্ধি বা পড়াশুনা কি আর আছে! লজ্জিত হই, নিজেদের একটু-আধটু শিক্ষার জোরে কতজনকে আমরা এরকম 'আণ্ডার এষ্টিমেট' করি)।

জগমোহনবাবু কিছুটা আত্মকথা বলেই বললেন—ইট-কাঠ-চুন-সুড়কি নিয়ে থাকলেও ভাববেন না মশাই, মনটাকে ঐ খোয়া-ঝামা করে ফেলেছি। ব্যবসাও বুঝলেন একটা শিল্প, অন্তত এককালে আমরা অনেকেই এরকম ভাবতাম! যাক্ সে অন্য কথা, ব্যবসার মধ্যে ঐ শিল্প-বোধটাও কালে কালে লুপ্ত হয়ে গেছে। যা বলছিলাম, রবি ঠাকুরের বই একটু আধটু এই ধরুন পড়েছিলাম। তা রাশিয়া ঘুরে এসে উনি যা বলেছিলেন খুব খাঁটি কথা।

"....মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি। জানি প্রকাণ্ড একটা বিপ্লবের উপরে রাশিয়া এই নবযুগের প্রতিষ্ঠা করেছে কিন্তু এই বিপ্লব মানুষের সবচেয়ে নিষ্ঠুর ও প্রবল রিপুর বিরুদ্ধে বিপ্লব।.... সব মানবের তরফে তাকিয়ে যখন ভাবি তখন এ মনে আপনি আসে যে, নব্য রাশিয়া মানব সভ্যতার পাঁজর থেকে একটা বড়ো মৃত্যু শেল তুলবার সাধনা করেছে, যেটাকে বলে লোভ..."

বাইরে তখন নামছে মৃত্ সন্ধ্যা। দখিনা বাতাসে নম্র শিহরণ। শাঁখ বেজে উঠছে পুবে-পশ্চিমে-উত্তরে-দক্ষিণে। আমাদের পরম বিস্ময় এখন যেন নীরব নমস্কার হয় জগমোহনবাবুর উদ্দেশ্যে। যে ধারণার কথা বলে জগমোহনবাবুর পরিচয়-পর্ব শুরু করেছিলাম বা ওনার সম্বন্ধে প্রথমে যে ধারণা তৈরী করেছিলাম, টের পাই সে ধারণা মন থেকে খসে গেছে কখন যেন ঝরা পাতা। চৈতালী সান্ধ্য পবন উড়িয়ে নিয়ে চলে গেছে তাকে অনেক দূরে।

আমি দাঁড়িয়ে থাকি এক গাছ, যেন অবনত—লজ্জানত।

এক পাষাণ লজ্জা বাড়ি ফেরার পথে অনেকক্ষণ আমাকে, অতীশকে জড়িয়ে ধরে থাকে। অনেকটা পথ আর আমাদের সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে আসে আরেকজন,—জমাট অন্ধকার।

অন্ধকারে ঢেকে আমার পথ ভাঙতে তখন খুব ভালো লাগে। অন্ধকারের স্নানে আমি বুঝি লজ্জার অথবা বেদনার ক্লেদ কিংবা ভার মুছে ফেলতে চাই। আলো পাওয়ার আগে বুঝি নীরব প্রার্থনা আমার—মানুষ, ক্ষমা করো আমাদের মূঢ়তা। কতটুকু আমি তোমায় চিনি? এ পৃথিবীর কতকিছুর কতটুকুই বা জানি আমরা?

হে সত্য, তোমার পাদমূলে নামাতে দাও আমার বিষাদের ভার।

(পাঁচ)

রিণি যখন ফুটফুটে ফুল হয়ে আট বছরের, আমি তখন কুচবিহারে কাজ করি। সাহিত্যের অধ্যাপক। সরকারী কলেজে অধ্যাপনা। কবির বাণী, 'হেথা নয়, অন্য কোন খানে' সার মেনেছি তখন জীবন-সত্য।

খুশীতে সেবার আমাদের পুজোর ছুটির ক'দিন যেন কেমন করে মিলিয়ে গেল এক গুচ্ছ বাহারী ফুল।

দীপা আমার স্ত্রী। তার এক ভাই বনবিভাগের বিট্ অফিসার। আমন্ত্রিত হয়ে আরো কিছু ঝলমল শারদ দিন কাটাতে যেখানে আমরা এলাম, জায়গাটির নাম মং পং। সেভক রোডে মাইল এগারো উত্তরে সুন্দর মঙ্গোলিয়ান স্থাপত্য রীতির সাক্ষ্যর বহন করে আধুনিক পূর্ত-বিদ্যার নৈপুণ্যময় নিদর্শন করনেশন সড়ক-সেতু। দু পাশে খাড়া পাহাড় আর পাহাড়,—ডুয়াসে'র পরিচিত বন—অপার শ্যামলী রাজত্ব,—আলো-আধারের আবহকালের লীলাময় খেলা ওখানে সারাবেলা! পাহাড়ী পথের বাঁকে বাঁকে বিস্ময় আর শিহরণ। বিরাট ক্যানভাস আরো অনন্য। বয়ে যায় পাশে পাশে রূপালী রেখায় রূপময় তিস্তা। আর আকাশ গাইছে যেন ওখানে কত উদাস।

সেতু পার হয়ে পুবে পাহাড়তলীর ঐ গ্রাম মং পং। গ্রাম বা পল্লী বুঝি নামেই। বনে বনে খাটে বা পাহাড়ের ধাপে এক চিলতে শাদা উঠোনে ফসলের আল্পনা আঁকে, পাহাড়ের স্তন থেকে নামা ফর্সা জল কুড়োতে যায়, এমন কিছু পাহাড়ী মানুষের মূলত ওখানে বসতি। আছে কিছু বনবিভাগের কাঠের টং-ঘর। বনবাবুর বসতি কাম অফিস।

খুব ভালো লাগল জায়গাটা। যেন আদিম উষার মিষ্টি হাসি মেখে নিয়ে কত যুগযুগান্ত ধরে দাড়িয়ে আছে এখানে আপ্লুত শালবন—বাণীহারা বন-বনানী। পিচ-এ্যাসফল্টে মোড়া দিগন্তে-হারা উধাও সুদূরের রঙমাখা সড়ক-কার্পে'টেও প্রতিফলিত মৌনতা। স্তব্ধতা ভাঙে তার কখনো কোন ছুটন্ত যন্ত্র-যান, প্রায়শ পথের এপার থেকে ওপারে যাওয়া বন-মোরগ, আর মাঝে মাঝে যূথচারী চকিত হরিণ। পাখীর ডাক এখানে মর্মর গানে সংমিশ্রিত হয়ে বাজে নৃত্যমান 'সিমফনি'।

আছে প্ল্যানটেশনের বাগিচা—নয়া বনশিশুর জন্মের সূতিকাগার। খিলখিল শিশু-জগৎ দেখতে দেখতে পাহাড়ের সিঁড়িতে নামি। নীচে ধূসর ছবি হওয়া তিস্তা। অদূরে কুয়াশার চিক মোড়া খিড়কিতে সেভক রেলসেতু। জল আর পাহাড়ে গম্ভীর কলতান তুলে বনের আড়ালে চলে যায় জলপাই রঙা আসাম মেল। বহুদূরে ঝিকমিক বালিয়ারিতে কাশ আর রোদ একযোগে খেলতে নামে, যেন কিশোরী তুই বনবালা। শান বাধানো তিস্তাবুড়ির ঘাট। চপল নূপুর বেজে চলে সেখানে মধুর তালে, খলবল মন-মাতান ওদের জলখেলা চলে অবিরাম।

মং পং এর পরের গ্রাম রং ঢং। ক্যামোফ্লেজে গাছ-গাছড়ার ওড়না পরে বনের মধ্যে হারিয়ে থাকা তেজস্বী এক সেনা নিবাস। স্পিডোমিটার ভেঙে ফেলছে সাঁই সাঁই জিপ। নেপালী ড্রাইভার বুক পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট খুলে গ্যাস-লাইট জ্বালিয়ে লম্বা লম্বা ধোয়ায় ছুড়ে দিচ্ছে পরম স্বস্তি। ট্রার্নিং গুলোতে শুধু হাতলে ব্রেক ধরতে হয়। আবার মুখের জ্বলন্ত সিগারেট প্রাণের আরাম উগরায়। হাতের একেক মোচড়ে ছন্নছাড়া 'গিয়ার'। চুপ করে থাকলে বুঝি মনে হয় সেতারে বেজে চলেছে মগ্ন জয়-জয়ন্তী। এক-সময় স্তব্ধ হয় সুর-লহরী। রেশ কিন্তু থেকে যায়। জিপ থামে পরম প্রাপ্তির আনন্দ ভেঙে যেখানে, সে জায়গার নাম বাগরাকোট। একটা কয়লা খনি আছে এখানে। কয়লা অবশ্য উৎকৃষ্ট জাতের নয়।

মিটার গেজের ট্রেনে চাপলেও দেখা—আর দেখা—চোখ মেলে শুধু চেয়ে থাকা—প্রকৃতির একই অঙ্গে কত রূপ। একটা ষ্টেশনের নাম পশ্বাশ্রয়। স্মৃতি র‍্যাকেটে চেপে ঝুপ্ করে যেন নামে গিয়ে সেখানে যেখানে পাঠশালাটি দোকান ঘরে, ছেলের দল পড়া করে। ফণী পণ্ডিত সচিৎকারে বলে যান—এই হেবো—বুঝলি, হ্রস্ব উ কিংবা দীর্ঘ উ ভিন্ন

অন্য স্বরবর্ণ পরে থাকিলে হ্রস্ব উ আর ঐ দীর্ঘ উ স্থানে ব্ হয়। ব্-ব্ ফলা হইয়া পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং পরের স্বর ব্-ফলাযুক্ত বর্ণের সহিত মিলিত হয়। পুরোনো শৈলীতে ব্যকরণ পড়ানো, আগে সূত্র পরে উদাহরণ।

গুরুমশায়ের সুরে মন্দ্র মেঘ-ধ্বনি—এই উচ্চিরিংয়ের দল বুঝেছিস ; —কপির দল, বল্ চেঁচিয়ে হেঁকে হেঁকে বল্—মনু যোগ অন্তর—মন্বন্তর, সু-যোগ আগত—স্বাগত, অনুযোগ-এষণ—অন্বেষণ, পশু + আশ্রয়—পশ্বাশ্রয়।

····বুকে হাঁফ ধরে ওঠে বেদনা। যেন বেদনার মীড আছড়ে পড়ছে কঠিন সময়ের বালু-তটে। হায় স্মৃতি! হায় শৈশব! নস্টালজিয়া, দাঁড়িয়ে আছিস তুই কত গানের ওপারে, সুরগুলো ছোঁয় তোর চরণ, আমি পাই না তো তোকে।

থম্ হয়ে ষ্টেশনের নাম পড়ি আবার,—পশ্বাশ্রয়। পাঠশালা, শৈশব, হারানো স্মৃতি, পাঠশালার বন্ধুরা, প্রণম্য গুরুমশায়, দুরন্ত সব দিন,—সমস্ত কিছুকে বুকে জড়িয়ে নিয়ে দেখি। চোখ জুড়িয়ে চেয়ে চেয়ে থাকি। সম্বিৎ ফেরে ষ্টেশনের কোন রেল-কর্মী ক্যানেস্তারা পেটানোর মতো ঘণ্টা বাজায়। লোহার পাতে তোলা একটানা শব্দধ্বনি। ট্রেন আসছে। সে ঘণ্টা ঢং ঢং-ঢং বাজে না। সে সুরে কখনোই না। আমি তবু ডাকঘরের অমলের মতো বসে থাকি। পাশে রিণি।

ট্রেন আসছে—ট্রেন আসছে। তোলপাড় কৈশোর। ঝড়ে কাঁপছে আছাড়ি-পাছাড়ি সমুদ্রের মধ্যে টিয়া রঙা এক অপরূপ দ্বীপ। অথবা দৃশ্যমঞ্চে ক্রমশ ঘনায়মান নাট্যদৃশ্যের উত্তালয়মান 'ক্লাইমেক্স'। এক সময় বিস্ফোরণ শেষ, সিনেমার রূপালী পর্দায় উত্তেজনাকর দৃশ্যের আবহে চড়ায় বেজে যেন ছুটে মিলিয়ে গেল দ্রুতগামী এক তীক্ষ্ণ সাইরেন।—সাইলেন্স কাট্।

কখন চলে যায় ট্রেন। যখন সব কিছু আবার যেমন ছিল স্থির, শুনতে পাই রিণি মিহিস্বরে প্রশ্ন করছে—বাবা, ট্রেনটা এ ষ্টেশনে থামলো না কেন···?

(ছয়)

লোক-কাব্য ময়মনসিংহ গীতিকায় জমি-পাওয়া বা বসবাস গড়া নিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে এক জায়গায় একটি মরমী আর্তি। রোটি-কাপড়া আউর মকান, যদিও এ বাণীতে ঠাঁই এর কথা, চাওয়ার শেষধাপে। অর্থাৎ বাঁচতে হলে আগে তো চাই পেটে দানা-পানি, তারপর শরম-সম্ভ্রম বাঁচানো, সভ্যতা-ভব্যতা,—সব শেষে মাথার ওপর আচ্ছাদন বা মাথা-গোঁজার আস্তানা। পাশাপাশি যোগের সংখ্যাগুলোকে বুঝি অবস্থা বিশেষে ওলোট-পালট করা যায়। যেমন কারো চিন্তায়, খাওয়া-দাওয়া জুটুক বা না জুটুক আগে তো লজ্জা নিবারণ, বস্ত্রহীনতা সভ্যতায় যে বড় গ্লানি। ধরে নিচ্ছি মানুষ না খেয়ে, আধপেটা খেয়ে কষ্টে-সৃষ্টেও বুঝি বাঁচে। চলে যাই সভ্যতার আদিম দশায়। প্রাকৃতিক পোষাকে তখন মানুষ; মাথার উপর জ্বলছে দাউদাউ সূর্যকুণ্ড, কখনো সমুদ্র নামছে আকাশ থেকে, শীতের জ্বালাকে তুলনা করা হয়েছে মৃত্যু সমান, মানুষ মরিয়া হয়ে চাইছে শুধু একটু আশ্রয়, নিরাপদ, সুরক্ষিত, মোটামুটি বাসের কোন ঠাঁই। সভ্যতার অন্যান্য কৌশল আয়ত্ব করার অন্যতম মানুষের থিতু হওয়ার সাধনা। সভ্যতার এক-রকম বলিষ্ঠ পদপাত তখন থেকেই।

ময়মনসিংহ গীতিকায় মহুয়া পালায় মহুয়া যে গোষ্ঠীর সেই হুমড়াদের যাযাবর জীবন। বেদে-বেদেনীর দল ঘুরে বেড়ায় আজ এখানে, কাল সেখানে। বসত গড়ার স্বপ্ন শুধু তাদের বুকে বেদনা। মর্মবেদনা ধ্বনিত এ কথায়—'হোতের (স্রোতের) হ্যাওলা (শ্যাওলা) হইয়্যা ফিইরি দ্যাশে দ্যাশে।' তাই যখনি বসত পাওয়ার সুযোগ

এল, ওরা বলছে—ট্যাহা পইসা (টাকা-পয়সা) চাই না মুরা (আমরা), জমি একহান (খান) চাই। গতর খাইট্যা ঘর বানামু, বন ও যদি পাই....। হায়, বনের পাখী সে-ও তো নীড়ে ফেরে, ফেরে আপন কুলায়, বনের পশু ফেরে গুহায়, আপন চেনা ঠাঁই-এ।

জগমোহনবাবু একরকম উদ্ধার করলেন। সাধ-সাধ্য সব খুলে জানিয়ে ছিলাম মানুষটাকে। করিৎকর্মা মানুষটি নিজের লোকের মতো করে সব জুটিয়ে দিলেন। ছোট্ট একটা ছিমছাম প্লট। টিপিকাল লেখনের ছাঁদময় আরবী-ফারসী-তৎসম-অ-তৎসম বর্ণাঢ্য ভাষা সমন্বিত অশোক স্তম্ভ ও চক্রলাঞ্ছিত আদালত স্বীকৃত কয়েকটি কাগজে জ্বলজ্বল করে চিহ্নিত হল ৮৫ দাগের ১৪ খতিয়ানে ২ কাঠা ৯ ছটাক ধরিত্রী খণ্ডের আমি মালিক।

তারপর দীপা একদিন লালপাড় গরদ পরল, মা পরল নূতন সাদা থান, রিণি ও মায়ের শাড়ি পরে সকাল থেকে যেন মজার কলা বৌ; আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধব অনেকের চোখে মুখে শুভ কামনা, আমি ঘেমে নেয়ে স্নান। জগমোহনবাবু সশরীরে দাঁড়িয়ে থেকে শুদ্ধাচারী গোস্বামী মশাইকে এক সময় বললেন—নাও হে গোঁসাই শুরু কর। রিণি কয়েকবার চেষ্টা করে পারল না, অবশেষে দীপাই তার হাত থেকে শাঁখ নিয়ে ফুঃ দিল। কারা যেন কল্‌কল করে হেসে উঠল, দিল উলুধ্বনি। বাতাস মেখেছে ধূপের গন্ধ। মাঙ্গলিকীর আছে এক চেনা রঙ। বর্ণচ্ছটায় সে মেলালো সে রঙ বাহার।

সহকর্মিগণ লঘু আলোচনায় খুঁজতে বসলেন এই শঙ্খ ও উলুধ্বনির যাবতীয় তত্ত্ব-তালাশ। হরিসাধনবাবু বললেন—গৃহ নির্মাণ ব্যাপারটায় যা কিছু অবদান অনার্যদের। বাস্তু নির্মাণ কৌশল আর্যরা শিখেছিল অনার্যদের কাছ থেকেই। মাথা নেড়ে তাল ঠুকল অতীশ। হরিসাধনবাবু বললেন, ঐ আদিম যুগেই মানুষ ব্যবহারিক প্রয়োজনে হাঁক-ডাক, ঐ প্লুতস্বরে কাউকে আহ্বান, হৈ রৈ, চিৎকার

চেঁচামেচির প্রক্রিয়া স্বাভাবিক ভাবেই শেখে। সেগুলির ধরণ-ধারণের বিশেষ বিশেষ তাৎপর্য সর্বজন গ্রাহ্য ছিল। আরো উচ্চকিতে কোন কিছু বিজ্ঞাপিত করার প্রয়োজন ও তা সমাধানের প্রয়োজনীয় কৌশল থেকে জন্ম নিল শুধুমাত্র মুখ-নিসৃত শব্দ ছাড়াও অন্য কিছুর ব্যবহার। শিঙা, ভেরি, তূর্য-নিনাদের সবিশেষ প্রয়োজনানুগ তাৎপর্য ক্রমশ পরবর্তীকালে লাভ করল নূতন মাত্রা। নানা তালবাদ্যে উন্নীত ব্যঞ্জনা ক্রমশ আকাশ পেল,—নান্দনিকতার। পাখা মেলা পাখির সামনে এসে হাজির হল তখন অন্য অসীম আকাশ।

ওদিকে গোস্বামী মশাই-এর উদাত্ত মন্ত্র পাঠ। সমবেত উলুধ্বনি চারদিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে। হরিসাধনবাবু আসর বেশ জমাট করে তুলেছেন! এক ফাঁকে পকেটে রাখা কৌটো বের করে একখিলি পান মুখে পুরে নিয়ে মগ্ন হন তা চর্বণে। কেষ্টবাবু আমারি সাবজেক্টের অধ্যাপক। জম্পেশ করে তিনি-ও সিগারেটে ত্বটো টান মেরে নেন।

জমিব একেবারে লাগোয়া এক বকুল গাছ। উচ্ছ্বসিত প্রাণ কিছু মানুষকে ছায়া দিতে আজ যেন সে বেশী উদার-শাখা-পল্লব।

হরিসাধনবাবু জিজ্ঞেস করলেন। সুনির্দিষ্টভাবে অবশ্য কাউকে নয়। —আচ্ছা আপনারা লক্ষ্য করেছেন কি, উলুধ্বনি ক'বার দেওয়া হচ্ছে তার উপরও অনুষ্ঠেয় ঘটনার বিশেষ দ্যোতনা নির্ভর করে। যেমন ধরুন জাতক-জাতিকার জন্ম ঘোষণার সংকেতদানে এই উলুধ্বনি উচ্চারণের সংখ্যার সবিশেষ অর্থ আছে। এতে এর আগে যা বলেছি এ'সব ধ্বনি-সৃষ্টির বিশেষ তাৎপর্য প্রমাণিত।

শাঁখ বাজানোর ব্যাপারটা নিয়ে অতীশ নিসন্দেহে বললো, ওটাতে আদিতে আর্যদের কোন সংস্রব ছিল না। এমন কী উত্তরাপথের অনার্যদের-ও সম্ভবত ওটির ব্যবহার অনায়ত্ত ছিল। অতীশ কিছুটা কপালের রেখায় কুঞ্চন খেলিয়ে মত জানাল, অথর্ব বেদে-ও শঙ্খ-ধ্বনির কথা আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। সম্ভবত মালাবরী কিংবা কোঙ্কন

উপকূল অথবা পূর্ব উপকূলের উপকূলবর্ত্তী মানুষদের দ্বারাই প্রথম শঙ্খের ব্যবহার। মহাভারতে সুস্পষ্টভাবে স্বয়ং অর্জুনের পাঞ্চজন্যের উল্লেখ পাওয়া যাচ্ছে।

বাস্তুদেবতার পূজা শেষে জগমোহনবাবুর হাঁকডাক। গোটা কয়েক মাটি কাটার মুনিস বা লোকজনকে তিনি নিয়ে এসেছিলেন আগেভাগেই। কালো পাথর থেকে কাটা কয়েকটি অপরূপ শিল্পকর্ম বসেছিল এদিক-সেদিক। গোস্বামী মশাই এর নির্দেশে তারা পূর্ত কাজের করল আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। আনুষ্ঠানিক হলেও পুরোদস্তুর ভিত কাটার কাজ শুরু করালেন জগমোহনবাবু সেদিন থেকেই। কারণ দ্রুত কাজ শেষ করানোর কি তাড়া ছিল। সামনেই নাকি হাত দিতে হবে, ওনার মতে অন্য কারো বিশাল এক রাজসূয় যজ্ঞে।

আশ্চর্য এখানেও এক দুজ্ঞেয় লোকাচার। রাজমিস্ত্রীর কাজ শুরু হওয়ার আগে একটি উঁচু বাঁশের মাথায় টাঙানো হল একটা ভাঙা ঝাঁড়ু, দু' পাটি ছেঁড়া জুতো, একটা ব্যবহারে ব্যবহারে ক্ষয়িত মশলা বয়া-নেওয়ার কড়াই।

এক ঝাঁক প্রশ্ন এবার সরাসরি জগমোহনবাবুকে ;—আচ্ছা, এগুলোর মানে কি ? গোস্বামীমশাই পাশে ছিলেন। যোগ দিলেন কথাতে—এগুলোকে এককথায় বলতে পারেন কিছু সংস্কার। আরব্ধ কাজে যাতে কারো কুদৃষ্টি না পড়ে তা থেকে বিরত করতে এক রকম সংস্কার হিসাবে এগুলো প্রাচীনকাল থেকে করা হয়ে আসছে। কবে, কোন্ সময় থেকে—এতকিছু আমি বলতে পারব না।

জগমোহনবাবু বললেন, এ তো অনেকেই জানি। তবে মশাই আমার একটা অন্য ধারণা আছে। কাজের শুরুতে এগুলো করার বুঝি অন্য মানে আছে। বাস্তু দেবতার পূজায় যে দেবতার কাছে আরব্ধ কাজ ভালভাবে হোক বা শুভ বসতের কামনা জানিয়ে প্রার্থনা আছে, মনে হয় তা ধরে বললে এ'গুলোর মানে এই হতে পারে, কাজ

শেষ হলে ঝাঁড়ু, কড়াই, পাছুকার যে দশা হয়, হে দেবতা, কাজের গোড়াতেই আমি প্রার্থনা করছি দ্রুত আমাকে সে কাজের সম্পূর্ণতা বা সাফল্য দাও। যদিও এ'সব আচার-অনুষ্ঠানের তাৎপর্য এখনো উদ্ধার হয়নি। কেউ কেউ এই রহস্যগুলোকে বলেছেন ভুয়ো-বিজ্ঞান।

হরিসাধনবাবু অধ্যাপকের মতোই মন্তব্য করেন—সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিনৌস্কি এগুলোকে একেবারে অসার বলে উড়িয়ে দেন নি। তার মতে, বিজ্ঞান আর জাছবিশ্বাস ছটোই ছিল আদিম মানুষের অবলম্বন। জাছবিশ্বাস অনেক সময় মানুষের বিজ্ঞান চেতনার সহায়ক হয়েছে। জাছবিশ্বাস তাকে আত্মপ্রত্যয় যুগিয়েছে, প্রকৃতিকে নিজের দখলে আনার কাজে সাহস সঞ্চার করেছে, এক কথায় তার বাস্তব জীবন-সংগ্রামে এগুলো ছিল অনেক বল-ভরসা।

আমিও একটা কথা যোগ করি—শাস্ত্রীয় আচারে অপশক্তিকে দূর করার জন্য কল্যানময় শক্তিকে আবাহন করা হয়। কিন্তু লৌকিক আচারে ছড়া-গান, আচার-অনুষ্ঠান, কখন-ও বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাটিকে তাড়ানো হয়। কাঙ্ক্ষিত বস্তু বা ঘটনাটির নকল ফুটিয়ে কামনা পূরণের আশা জাগিয়ে তোলা হয় .. ।

··· রিণিকে দিয়ে আমি একটা গন্ধরাজের চারা পোতালাম। রিণির হাতে পোতা সে গাছ আজও আছে। বকুল গাছের একটু দূরে একটা ফলকে পরে বাড়ির নাম লেখা হয়েছিল 'রিণি'। গাছটা তার পাশেই।

বেঁচে আছে এক হুর্মর স্মৃতি।

(সাত)

পি সি সরকারের ইন্দ্রজাল দেখে চমৎকৃত হয় নি এমন মানুষ কেউ আছেন কি! আশ্চর্য কর্মকাণ্ডের মিছিল দেখে মনে ধাঁধা লাগে, আর চক্ষু ওঠে চড়ক-গাছে।

বছর ঘুরতে না ঘুরতেই আমার নয়াবসতে কে দিয়েছে ফুস-মন্তর।

শুধু কি ঐ বাগুইআটি। আরব্য রজনীর আলাদিনের এখন বুঝি জবরদস্ত নয়া-সাকিন এখানেই। ""চোখ বোজ, এক দুই তিন, চোখ খোল। এ বাল-বাচ্চা-লোগ, জোরসে হাততালি বাজাও। দেখিয়ে কেয়া হর কিসিমৎ ডেরা। ঝুঁপড়ি দেখো, কুঠিয়া দেখো, মহাল দেখো, কেয়া বাংলো দেখো,, ম্যানসন দেখো। ঔর দেখো-দেখো কিত্‌নে কিস্‌মতওয়ালা আদমি হ্যায় দুনিয়াপর—লাগ, ভেলকি লাগ,—সারে দুনিয়াকা ইনসান্ আপনা আপনা নজদিগ্‌কো পাশ্‌.... ।

মানুষ আর মানুষ। ঘর-বাড়ি আর বাড়ি। মাথা গোঁজার ঠাঁই আব আস্তানা। বাসা আর বাসস্থান। যেন একটা বিরাট প্রতিযোগিতা চলেছে—একটা মস্ত হুল্লোড়। মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। হাজার-হাজার, লক্ষ লক্ষ মানুষ। পৃথিবীর সব জমি বুঝি ফুরিয়ে যাবে। আকাশে-বাতাসে যেন শোনা যাচ্ছে কোন বার্তা একটুকুন-ও ফাঁকা থাকবে না এই ধরিত্রীর বুক। —তার কোলে ঠাঁই পাওয়ার পালা বুঝি ঐ শেষ হয়ে আসে।

জগমোহনবাবু বছর কয়েক হয় মারা গেছেন। তার এক ছেলে বলেছিল—আপনি যে জমি কিনেছেন, ঐ জমিই আপনি এখুনি বলুন বিক্রি করবেন, আমি আপনাকে এই এখানে বসেই দশগুণ বেশি দাম দিচ্ছি। আর জিনিষ-পত্র মাল-মেটেরিয়াল, শুনে রাখুন সকালে যে দর ছিল, বিকেলেই হয়তো তা পাল্টে গেছে।

আন্দাজ যে কিছু করতে পারি না তা নয়। এই তো সেদিন কে বলছিলেন, এক বাজেটেই সিমেণ্টের দর বেড়েছে উনিশ না কুড়িবার। আমি ছবি আঁকতে পারি না। তবে কল্পনায় আমার একটা ছবি আসে, মানুষ কি একটা ধরতে চেষ্টা করছে। ব্যবধানের যেন দুটো হাত আছে—খুব লম্বা হাত, আর তালগাছের মতো দুটো ঢ্যাঙা পা। হাতগুলো দিয়ে সে মানুষের চাওয়াকে অনেক উঁচুতে ছুঁড়ে দিচ্ছে,

অন্যদিকে একই সময় প্রচণ্ড পদাঘাত হাত-বাড়ানো মানুষকে বহু যোজন দূরে ছিটকে দিচ্ছে।

কুম্ভীপাকে ঘুরছে মানুষ আর মানুষ, ঘুরছে তার চাওয়া-পাওয়া।

নাগরদোলায় চেপে আমি-ও দেখি বাগুইআটি। দেখি বসত-গড়ার আয়োজন। আর দেখি মাটির বিম্বিত কাচে মুখর জীবন,—প্রিজমে ছিটকায় কত যে রঙ!....

....ক্ষেত্রবাবু রিটায়ারমেণ্টের পর পাওনা-গণ্ডা দিয়ে দু' কাঠা জমি কিনেছিলেন। তারপর একটা সাদামাটা টিনের চালা বানাতে যথার্থই কপর্দকশূন্য। কুড়ি বছর ভাড়া বাড়িতে যাযাবরের মতো ঘুরেছেন। ঘরে দুটো মেয়ে, বিয়ের বয়স হয়েছে। এক ছেলে সবে সবকারী চাকরীতে ঢুকেছে। ছোটছেলে মাঝে মাঝেই দেখা হলে আকুতির একটা নিস্প্রাণ প্রতিমূর্তি,—কাকু, কাউকে বলে-টলে একটু দেখুন না, যে কোন কিছু হলেই...।

শ্যামাদাস সকালে আগে বাড়ি বাড়ি খবরের কাগজ দিত। এখন কোথা থেকে মাদার ডেয়ারির প্যাকেট এনে বিক্রি করে। দুপুরে বুঝি একটা প্রেসে কাজ শিখতে যায়। যতীনবাবু খুব কষ্ট করে ছেলেটাকে পড়িয়েছিলেন। প্রথম প্রথম দেখা হলেই বড় আশা নিয়ে বলতেন, আমার শ্যামাদাস, বি-এ পাশ....।

আমার বাড়ির পূব দিকে অলক সেন হার্ট স্পেশালিষ্ট; পি রায়, বার এট ল; কৌশিক বসু খবরের কাগজের সাংবাদিক; নগেন বসাক বৌবাজারের সোনার কারবারী। আশে-পাশে তার নানা আত্মীয়-স্বজনের প্রাসাদোপম বাড়ি, সকলেই জুয়েলার্স। ডাইনে-বাঁয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন সরকারী চাকুরে, ইঞ্জিনিয়ার, ছোট-বড় ব্যবসায়ী, শিক্ষক, অধ্যাপক, এমন কি গুল কারখানার মালিক। মাঝে মধ্যে আছেন ঐ ক্ষেত্রবাবু, যতীনবাবু, রমেনবাবু, অমল-নির্মল-

কেষ্টবাবুরা যাদের ঘর বা বাসাগুলো মূর্তিমান এক একটা সমস্যার ভাঁড়ার।

আরো আছেন,—দিবাকর, করগেটেড টিনের চার বাই সাত এক ঘরের মধ্যে বসে আক্ষরিক অর্থে রাতদিন একটা পুরোনো সেলাই মেসিন চালায়। পুরোনো নড়বড়ে একটা সিংগার মেশিন, ওকে নিয়েই তার জান-মান। ঋত্বিক ঘটকের অযান্ত্রিকের কথা কেন যেন দিবাকরকে দেখলেই আমার মনে আসে।

উল্টোডাঙার প্লাইউড কারখানায় কাজ করতে যায় গণেশ, বিশু উত্তম বলেরা। শয়ে শয়ে রজনীবাবুরা যান নানা কলকারখানার নিত্যদিনের খোরাক হতে। ওদের ঘর-দুয়ারে গ্রীষ্মকালে থর, কালাহাণ্ডি বা তাকলামাকান মরুভূমি বেড়াতে আসে; পূর্ণিমার রাতে দূরের আকাশ ঘরের চালের ফুঁটো-ফাটায় ঠিক যেন মনে হয় পাড়ায় পাড়ায় একসময় খুব ঘুরে বেড়াতো যে শিশু-ভুলানো মুখ বন্ধ নানা ঘুলঘুলি লাগানো বায়োস্কোপের মজার বাক্স, তাতে প্রতিবিম্বিত রূপ-কথার জগতে ভাঙা চালার ফাঁক-ফোঁকরে চোখ লাগিয়ে ওরা থাকেন ওভাবেই। শীতে দিক-দিগন্তের ল্যাণ্ডস্কেপ যেন তুহিন উত্তর মেরু বা সাইবেরিয়া। হিমগ্রাসে আশ্চর্য, ওরা তবু কাবু নন। ওদের ঘর-গুলো কি ইগলু! শাদা ভাল্লুক, সিন্ধুঘোটক কিংবা শীলমাছের চামড়া ওরা কি গায়ে পরে নেন! ঘুরে বেড়ান এক দঙ্গল এস্কিমো বা মেরু-মানুষ! আর বর্ষা—আবহমানকাল ওদের চোখের অশ্রু, বুকের খাঁ খাঁ শ্বাসের ভয়ঙ্কর সমন্বয়।

আমার বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করে বিন্দুবাসিনী। সে একদিন আমাকে ওদের আস্তানা দেখাতে নিয়ে গিয়েছিল বাড়ি থেকে কিছুটা তফাতে। একটা বড় নর্দমার পাশে হাজার হাজার বিন্দুবাসিনীদের ঘর-গেরস্থালি। নেমেছি যেন ভিন্ন গ্রহে! বুকের মধ্যে বিবেককে আগে চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে-নাড়িয়ে জোরে প্রশ্ন করতে হয়—বলো আগে

এদের তুমি মানুষ বলবে কিনা ? এ জীবন মানুষের জীবন ? বনের পশু বলো, এর থেকে আরো ভালোভাবে থাকে কি না ?

পূতি গন্ধের জল বয়ে যাচ্ছে গোঁজা-গুঁজি ভরা কুঁড়ের পাশ দিয়ে। সভ্যতার যাবতীয় ক্লেদের বহমানা স্রোতে নিশিদিন কি উৎকট গন্ধ! ভূমোশ গন্ধের জল আলকাতরার মতো কালো। সে জল ঢুকেছে প্রখর গ্রীষ্মদিনেই অনেকের আঙিনায়, কারো কারো টং ঘরের নীচে। একটা বিষের তীব্র গন্ধ উঠছে জল থেকে। সে জল ভেঙে উচু চরায় অনেকের যাওয়া-আসা আপন আপন বাসস্থানে।

শুদ্ধ জল এখানে স্বপ্নের মতো দামী। প্রতিদিন অনেকের নানা নিত্যকৃত্য ঐ ভয়ংকর দূষিত জলেই। লাজ-লজ্জা-ঘৃণাবোধ এদের পাঁচ ইন্দ্রিয় থেকে কবে যেন লুপ্ত।

শাদা রঙের জল পড়ে সরকারী গোটা দুই নলকূপ থেকে। সেখানে জলের ধারা যখন নামে তখন ভোর ; বিভৎসতা দেখে লজ্জায় সে লাল থাকে, সূর্যাস্তও লালিমা মেখে অন্ধকারে মুখ লুকায়।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের সেই কবি এখানে এসেছিলেন কি ?—যিনি লিখেছিলেন—শিশুরা ক্ষুধায় শীর্ণ, বন্ধুরা বিমুখ, ঘড়ায় জল নেই; তাতেও দুঃখ ছিল না, কিন্তু দুঃখ রাখি কোথায় যখন দেখি—ছেঁড়া কাপড় সেলাই করার জন্য ছুঁচ চাইতে গিয়ে গিন্নি পেলেন পড়শীর গঞ্জনা।....

দরিদ্র মায়ের ছবি আঁকতে গিয়েই কি প্রায় আটশ বছর আগের বাঙালী কবি কলম চুবিয়েছেন এখানের দেখা রূঢ় সত্যে ?—নিজে দারিদ্র্যে শীর্ণ, ক্ষুধায় বাল-বাচ্চার চোখ বসে গেছে, পেট নাবাল, হতভাগী চোখের জলে গাল ভাসিয়ে প্রার্থনা করছে,—হে এক মুঠো চাল, তুমি একমাস যেও।....

এগার'শ শতকের সদুক্তি কর্ণামৃতের কবি শ্রীধর দাস আজ যেন আমার সঙ্গে কেষ্টপুর খালের পাশে দাঁড়ানো। সংস্কৃত শ্লোক

সাদামাটা বাংলা করে উচ্চারণে তিনি বলে যান—কাঠের খুঁটি নড়বড় করছে, মাটির দেয়াল ধ্বসে পড়ছে, চালের খড় উজাড়, আমার নড়বড়ে ঘরের স্যাতাল মাটিতে কেঁচোর সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছে ব্যাঙ।....

বিন্ধ্যবাসিনীর মুখের দিকে আমি তাকাতে চেষ্টা করি, খুব ধূসর লাগে। তুমি কি কবিকঙ্কনের ফুল্লরা! কই, তুমি তো আমাকে কোনদিন বারমাস্যা শোনাও নি!

তোমার বাসস্থানে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিমতা। এখানকার মানুষ বিধ্বস্ত এক পৃথিবীর বাসিন্দা। তাদের পেটে ক্ষুধার অক্টোপাস সহস্র মুখে কিলবিল করে। বঞ্চনা জমে জমে তোমাদের বুকে দুঃখ যে জীবাশ্ম, ফসিল। দারিদ্র্য রক্ত-মাংস-অস্থির মধ্যে মিলে-মিশে একাকার।

বিন্ধ্যবাসিনী তুমি তো বলো নি, তোমার স্বামী রাতে নেশা করে একটা পশু এসে গুহায় ঢোকে!

—না, বাবু না, মানুষটি অমনধারা কোন দিন-ই ছ্যেল না।....

তুমি তো বলো নি, তোমার বড় ছেলে ভগীরথ দিনে জুয়া খেলে, রাতে রেল লাইনের ধারে ওয়াগন ভাঙতে যায়! রাতে তোমাদের পাড়ায় মাঝে মাঝে কি হুল্লোড়, খালের ওপর দাঁড়িয়ে কারা বোমা ফাটায়,—পরদিন সকালে পুলিশ আসে,—ভগীরথের সঙ্গে কি কান-কথা বলাবলি করে!

—ছেলেটা এমন ছ্যেল না বাবু। কতদিন আগে পরীক্ষায় পাশ দেয়ে আমারে পেন্নাম কয়রে বলেছ্যেল—মা, বাবার আর কাম করতি হবে না, এবার আমি চাকরি করে এনে সবারে খাওয়াব ...।

বলো নি তো, তোমার মেয়ে মালতী কুপথে গেছে!—

—না বাবু না, আমাগো ঐ বস্তী আমাদের চরম সর্বনাশ করে দেছে। বাবু, ঐ ডাইনি আমাদের খেয়ে ঝাঁঝড়া করে দেছে। আমরা আর মানুষ লাই বাবু, মানুষ লই।....

বিন্দুবাসিনী একদিন দীপাকে বলেছিল —মা একদিন আমাদের সব ছ্যেল। ওই পারে বাংলাদেশে আমার ঘর, সোনা-সংসার ছ্যেল। মা, তোমরা তো লেখা-পড়া জানা মেয়ে। একটু সহজ করে কইতে পার, কেন আজ আমি ঝি হইলাম? ""কোন্ স্বাধীনতা আমগো কপালে মিলল—খালি যে চোখের জলের শেকল"" !

বিন্দুবাসিনীদের প্রশ্নের আরেক নাম কি বোবা ইতিহাস ? চোখের জলের সংবৎসরের ধারাপাতের নাম কি শাশ্বত শ্রাবণ ?

চুপ, সভ্যতা ঘুমোতে গেছে। কেউ তাকে বিরক্ত করো না। আমি সেদিন আস্তে আস্তে বাড়ি ফিরে দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম ।

(আট)

খগেনবাবুর সঙ্গে কিভাবে আমার প্রথম পরিচয়, খেয়াল নেই। সম্ভবত ট্রেনে বা বাসে যাতায়াতের পথেই আলাপ। ভদ্রলোক সদালাপী। মফস্বলের একটা স্কুলে পণ্ডিতী করেন। সংস্কৃত ভাষার আবশ্যিক পাঠের দিন ফুরোনোয় এখন সাধারণ শিক্ষক। নিজেই নিজেকে পরিচয় করান এইভাবে,—ওয়ান্স আপ অন এ টাইম এ রিনাউনড স্কুল পণ্ডিত, নাউ এ কাঁঠালি কলা ইন সর্বঘটে। ""ওনার বৈশিষ্ট্য কথায় কথায় প্রবাদ-প্রবচন উচ্চারণ করা।

বাড়ি করার পর একদিন আচমকাই দেখা করতে এলেন। খোশ আলাপ নিয়ে ঘরে ঢুকেই একরকম সরস বচন, কুঁড়ে হোক, পর নয়, নিজ ঘর খাসা। ""তা মশাই, ভালোই করেছেন—বর্ষায় যদিও একটু-আধটু ভোগান্তি হবে; তবে চন্দ্রে কলঙ্ক না হলো তো চাঁদই হলো না। কই মিসেস কোথায় গেলেন? চেয়ারে বসতে বসতেই অন্দর-মহলের উদ্দেশ্যে আন্তরিকতামাখা সম্বোধন—আজ কিন্তু ঐ শুধু চা-বিস্কুট বা চানাচুরেই ভবী ভুলছেন না। চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়ের চাই মোটামুটি আয়োজন। একে ব্রাহ্মণ, তায় আবার অতিথি-

নারায়ণ। পুরোনো আদিখ্যেতা মানুন বা না মানুন, আমি এই বসলাম চেপে।

দীপা, রিনি যথাসময়েই আসে। বয়সে খগেনবাবু আমার থেকে বেশ বড়ই। আচরণে একটা সস্নেহ ভাব। সম্মিলন তাই আনন্দঘন হয়ে ওঠে। এক ফাঁকে দীপা ভেতর থেকে ঘুরে আসে। রিণি অন্য কোথাও চলে যায়।

....সামনে বসা দীপাকেই প্রধানত উদ্দেশ্য করে তারপর খগেনবাবু বৈঠকী চালে আসর জমান—বুঝলে বৌমা, বাড়ি যে করেছ এ জায়গায় তা এখানকার বিশেষত্বটা কি? দীপা সহাস্যে উত্তর দেয়—সে সব আর কি! ধরা-ছোঁয়ার মধ্যে জায়গা, মোটামুটি যা চাওয়া তার একরকম সুবিধা-সুযোগ একটু মিলবে এই আশা।....

....সামান্যদূর দিয়েই বাদশাহী সড়ক,—হরদম টগবগ ছুটছে নানা পক্ষীরাজ,—ভাত-ঘুম কাটতে না কাটতেই একেবারে খাস রাজধানী। তায় শোনা যাচ্ছে, সুয়োরাণির কপালের দশা ভালো নয়, কোন্ দুয়োরাণি কখন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হন!—দীপার মুখের কথা কেড়ে নিয়েই খগেনবাবু সরসভাবে বলে যান। আনন্দের হাটে ক্রমে ক্রমে ষোলকলা লাগে।

আমিও চপলভাবে মাঝে মন্তব্য করি—তা খগেনবাবুর বিচার্যে বাগুইআটির কি বৈশিষ্ট্য ধরা দিল?

আগেই বলেছি, মানুষটি বেশ আসর জমিয়ে তুলতে পারেন। এক রাউণ্ড চা ও অন্যান্য ভোজ্যে বোঝা যায় তিনি বেশ বল পেয়েছেন। আরো আয়েসীভাবে বসে নিয়ে একটু গভীরস্থ হন। চোখ বন্ধ করেই তারপর শুরু করেন,—তবে শুনুন, আগে বলি জায়গা-মাহাত্ম্য নিয়ে কিছু প্রবাদ। তবে একটা কথা মশাই আগেই বলছি, এসব লোক-চলাচলের কথা। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা আঞ্চলিক চরিত্রের বিবরণ হিসেবে এগুলো বোধ হয় সত্যি নয়, সরসতার জন্যই

মুখ্যত এগুলোর আকর্ষণ। ঐতিহাসিকরা সামগ্রিকভাবে তাদের উপকরণ হিসেবে এদের একটু-আধটু হয়তো ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রমাণ হিসেবে এগুলো কখনো ব্যবহার্য নয়। যেমন এই যে, আমার দীপামার বাড়ি তো ঐ শান্তিপুরে? কি তাই তো, ঠিক বলেছি তো! তা প্রবাদ যে আপ্তবাক্য নয় তার প্রমাণ হয়ে সাক্ষাৎ দেবী তো সামনেই উপস্থিত। প্রবচনে শান্তিপুরের মেয়েদের নিয়ে যা বলা হয়েছে দীপামাকে দেখেই বুঝেছি ও-আপ্তবাক্য একেবারে ডাহা মিথ্যা।

আমার-দীপার চোখে চোখে সহাস্য হাস্য বিনিময়। দীপা কিছুটা সলাজে জিজ্ঞাসা করে—তা আপ্তবাক্যটা কি শুনি?

—না, না, আপ্তবাক্য হতে যাবে কোন্ দুঃখে!

—ঠিক আছে, ঠিক আছে, তা বলুন না কি শুনি ?

—তবে শোন—উলোর মেয়ের কুলুজি, অগ্রদ্বীপের-খোঁপা, শান্তিপুরের হাতনাড়া, গুপ্তিপাড়ার চোপা, বলেই খগেনবাবু হো হো করে নিজেই হেসে ওঠেন। আমি দীপা-ও বেশ সহাস্য হই।

ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করি—তা স্থান মাহাত্ম্যের প্রবচনগুলি কি ?

—মাহাত্ম্য-টাহাত্ম্য কিনা জানি না। ধরে নেওয়া যায় পাঁচালি ঢং-এ এসব সরস কূট-কাচালি।""পাঁচালির মতো টিপিক্যাল সুরেই তারপর খগেনবাবু বলতে থাকেন—

আম আমড়া কুঁজড়া ধান এই তিন নিয়ে বর্ধমান
লম্বা কোঁচা কাছা টান তবে জানবে বর্ধমান
কলাপাতা কাঠের ঝাঁটি এই নিয়ে বৈদ্যবাটি
বেটি মাটি মিথ্যা কথা এই তিন নিয়ে কলকাতা
ঝাঁকুড়া বাঁকুড়াবাসী মুড়ি খায় রাশি রাশি
পোস্ত টক কলাইয়ের ডাল এই তিন বীরভূমের চাল
চিঁড়ে চেটাই ঝেঁতলা তিন নিয়ে চেতলা
তাঁতি গোঁসাই পচাভুর এই তিন নিয়ে শান্তিপুর

গাঁজা গুলি অম্বডাঙা তিন নিয়ে ফরাসডাঙা
মোগল মিশি মাথাঘসা তিন দেখতে হুগলি আনা
বাঁশ বাকশো ডোবা তিন নদের শোভা
ধান খুন খাল তিন নিয়ে বরিশাল
বেহারা বেরসিক বাঁকা তিন নিয়ে ঢাকা
চাল চিঁড়ে গুড় তিন নিয়ে দিনাজপুর
কুঁজড়া কাওয়ারি স্থর তিন মেদিনীপুর
পোল পাগল গুলো তিন নিয়ে উলো
কাগজ কলম কালি তিন নিয়ে বালি
গাঁজা তাড়ি প্রবঞ্চনা তিন নিয়ে শরশুনা
গুলি খিলি মতিচুর তিন নিয়ে বিষ্ণুপুর
বাঁদর সভাকর মদের ঘড়া তিন নিয়ে গুপ্তিপাড়া
তাল বাবলা ছুঁচো বোঁচা এই চার নিয়ে মুড়োগাছা
রাস তাস জোরের লাঠি তিন নিয়ে পানিহাটি
তরকারিতে দেয় না নুন, বাড়ি কোথায় আমারুন।

রসাল কথকতায় নানা স্থানের বিশেষত্ব ও স্থানবাসীর আচার বর্ণনায় বাদ সাধে বেরসিক মাছি। সামনে পরিবেশিত নানা খাদ্যে দিন শেষ হওয়ার আগে মক্ষিকাদের অভিযানের লক্ষ্যনীয় পরিকল্পনা।

দীপাই মাঝখানে ছেদ ঘটিয়ে সহাস্যে বলে ওঠে—জানি, জানি শেষ করবেন তো এই বলে যে, রাতে মশা দিনে মাছি, এই নিয়ে কলকাতায় আছি ;—তা নয়, ওখানে বাগুইহাটিই বসিয়ে নিন—কিন্তু প্রবাদ আপ্তবাক্য হওয়ার আগে নিন আর বসে না থেকে চটপট হাত লাগান।

খগেনবাবু হাত নেড়ে বলে ওঠেন, না বৌমা আরেকটু যোগ করতে হবে—খানা-খন্দে মরি বাঁচি তাই নিয়ে বাগুইহাটি আছি। বাপরে বাপ, বাড়ির সামনে কি বিরাট গর্ত। সাক্ষাৎ মরণ-ফাঁদ। অন্ধকারে এলে তো স্বর্গের টিকিট একটুকুনও কষ্ট করে কাটতে হবে না !

খগেনবাবুর আলোচ্য বাড়ির সামনের বস্তুত একটা গর্ত নিয়ে। একটা ম্যানহোলের ঢাকনি মাসখানেক আগে চুরি গেছে। প্রথম কয়েকদিন এ' নিয়ে কাউকেই প্রায় মাথা-ঘামাতে দেখি নি। চেষ্টা-চরিত্র করে অবশেষে যদিও একটা কাগজে আবেদনপত্র, কিছু সই-সাবুদ করানো হল, কিন্তু ওটি যথাস্থানে পাঠানো ততোধিক দুরূহ কার্য।

হায়, শহরবাসী আমরা প্রত্যেকেই এক-একটা আলাদা আলাদা দ্বীপের মধ্যে আটকে যাচ্ছি। ক্ষুদ্রতায়-দীনতায় ক্ষুদ্র,—আরো ক্ষুদ্র-বদ্ধ হওয়ার সাধনা।

স্কুলে পড়া একটা কবিতার কথা খুব মনে পড়ে,—'পথের মোড়ে ছিল পড়ে প্রকাণ্ড এক পাথর।'····মানুষ-জন যায় আসে। পাথরে হোঁচট খায়, পা ভাঙে, হাত ভাঙে, আহত হয়। পাথর কেউ সরায় না। একদিন এক নগন্য মানুষ আপন চরম সাধ্য দিয়ে পাথরখানিকে গড়িয়ে দিল ঠেলে। কিন্তু এ কী, পাথরের নীচে তার জন্য বুঝি বিধাতার প্রসন্ন আশীর্বাদ,—রয়েছে মোহরের এক থলি। কবিতার শেষ অংশটায় নিশ্চিত কবি-কল্পিত নীতি উপদেশ।

কিন্তু কেন যেন মনে হয়, একদিন এখানে যেকোন উদারতা দেখানোর জন্যও পুরস্কারের টোপ বিজ্ঞাপিত করতে হবে।

কপালের রেখায় ভাঁজ তুলে কেউ প্রশ্ন তুলবেন, were men so? গলার রগ ফুলিয়ে কেউ বলবেন—No, men were made so.

অরণ্য-জঙ্গলের পশুরা, তোমাদের চামড়াগুলো খুলে সেদিন আমাদের দিও। নগদা নগদ নিশ্চিত উচ্চমূল্য পাবে।

(নয়)

শ্যালকের অফিস-বাংলো থেকে একদিন বাসে গেছি ওদলাবাড়ি হাট। নানা অফিসবাবু, নেপালী, সিকিম, ভোটিয়া, মদেশিয়া ও অন্যান্য মানুষের সমাগমে সেখানে বিকি-কিনির গমগম ব্যস্ততা। একমাত্র টকি হাউসটির সামনে দাঁড়িয়ে চোখ রেখে দিয়েছি আনমনেই ভিন ছবির দোলায়মান ক্যানভাসে। সামনে এসে দাঁড়াল এক যুবক। সারা মুখময় ডুয়ার্সের জঙ্গলের মতো দাঁড়ি। বনের ওপর দিয়ে বুঝি বয়ে গেছে শিন্‌শিন্‌ হাওয়া। চুল এলোমেলো। সারা গায়ে নানা পাহাড়ী নদীর উৎক্ষিপ্ত বালি। যুবকের গায়ে-পোষাকে কিচ্‌কিচ্‌ করছে ধুলো। গায়েব রঙ কি এক সময় ফর্সা ছিল! স্মৃতি একটু পথ ছাড়ে ছায়াময় আলোয়। আপাত দর্শনে যুবক। যুবাবয়স কিন্তু এখন ভাঙা নদীর পাড়, বিধ্বস্ত বিপন্ন মাটির মূর্ত সাক্ষ্যরে। ঠিক আমার সামনে এসে সে দাঁড়ানো। চোখ অন্ধকারে খুঁজছে যেন কোন হারানো ধন।—অন্ধকারে ঘুরছে এক উজ্জ্বল সার্চ-লাইট। আমি-ও খুঁটিয়ে দেখছি—কে এ? পোষাকে-আশাকে তো এক পথ-মজুর, পি ডব্লু ডি-র আবহমানকালের কাজের বিশ্বকর্মা কারিগর—সোজা ভাষায় মজুর, সাহেব-সুবোর গাল ভরা নামে যাকে সচরাচর ডাকা হয় কুলি বলে।

অরণ্য কাঁপানো বিস্ময় নিয়ে যুবকের জিজ্ঞাসা—অচিন্ত্যদা না? আপনি এখানে?

মস্তিষ্কে স্মরণের রিল দ্রুত ঘুরে যাচ্ছে। ট্রলপ ট্রলপ পায়ে ধু ধু প্রান্তর দিয়ে যেন ছুটে যায় বর্শা-উঁচানো একদল অশ্বারোহী। ধুলার ঝড়ে হারিয়ে আমি দিশা খুঁজছি—প্রাণপণে খুঁজছি। —কোথায় দেখেছি? কোথায়? কোথায়? কে ও?

চোখ বুঝি আন্দোলয়মান সমুদ্র, বুঝি সেখানে টালমাটাল

ল্যাণ্ডস্কেপ, কাঁপছে অতলান্ত গহীন। বুঝতে পেরেছে যুবক স্তব্ধতার ভাষা। নিজেই পরিচয় দেয়,—আমি শাশ্বত···· ।

একটা গ্লেসিয়ার খাড়া পাহাড়ে গড়াতে গড়াতে ঝপ করে নেমে এল উপত্যকায়। একটা উত্তুঙ্গ ঢেউ বালুকা-বেলায় সশব্দে আছড়ে পড়ে এখন খেলছে ঝিকিমিকি প্রশান্ত চপলতা। আমি স্তম্ভিত প্রায় জিজ্ঞাসা করি—শা—শ্ব—ত, শাশ্বত সেন!—মানে তুমি নবীনবাবুর ছেলে?

শাশ্বতর মূর্তি আমার পায়ে কখন নুয়ে পড়েছে।

দু' হাত বাড়িয়ে তুলি। ভালো করে উজাড় স্নেহে ওকে দেখি—নয়ন ভরে দেখি। —এ কী দশা হয়েছে তোমার? তুমি এখানে—এ—ভা—বে?

—সামনে পি ডব্লু ডির রাস্তার কাজ হচ্ছে।····আমার কুলির কাজ····আমি····

কোন রুদ্ধ ঘরের ভেতরে যেন স্মৃতি। বন্ধ দরজায় মরিয়া আঘাত করছি। কত বছর হবে? বারো—চোদ্দ—পনের?····মধ্যরাতে বাড়ির চারপাশে ভারী বুটের শব্দ। দীপা ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছিল। দরজা খুলব কিনা ভাবছি! সুইচ অন করতে গিয়েও করলাম না। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ। মনে হল বাড়ির সামনে একটা প্রিজনভ্যান এসে দাঁড়াল। দুপ্‌দাপ্‌ আরো শব্দ—এক লহমায় অনেক শব্দ। স্তব্ধতা ভেঙে এক সময় তীক্ষ্ণ স্বর,—হল্ট—হল্ট। থপ্‌থপ করে কারা যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেল। ক্ষেপা কুকুর হয়ে ছুটে গেল এরপরই একটা জিপ। স্তব্ধতাও যেন দ্রুত ছুটতে চাইছে, ওর পায়ে ঘড়ির কাঁটার দুটো ক্ষীণ রণপা। পাশের বাড়িতে বাজছে অতোলা টেলিফোন—ক্রিং ক্রিং-ক্রিং। গা-ছমছম ভুতুড়ে বাড়িতে হটাৎ দেওয়াল ঘড়ি পেঁচা ডাকার আওয়াজে বাজল ঢং ঢং। রাত

ছুটো। সেকেণ্ড-মিনিটের কাঁটার শব্দ হেঁটে যাচ্ছে শুধু,—মধ্যরাতে নিঃসীম অন্ধকারে খাঁ খাঁ শ্মশানে এক মহাভৈরব।

এক সময় আমার দরজায় করাঘাত—প্রোফেসর রায়,…। আমি দরজা খুলি। সশস্ত্র এক বাহিনীসহ থানার ও সি। এক নিমেষে চারদিক তাকিয়ে নিই। পজিশন নেওয়া এ্যাডভান্সড সেকটরের যেন কোন ওয়ার ফ্রণ্ট।

অফিসার ইনচার্জ হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করেন—আপনার বাড়ির পেছন দিয়ে বাড়িতে কি কেউ ঢুকেছে? পাঁচিল টপকে …?

—বলা তো একেবারেই অসম্ভব! সবাই অনেকক্ষণ হয় ঘুমোতে গেছি। এ ছাড়া পাঁচিল টপকে এ পাশে আসা তো বেশ দুরূহ ব্যাপার, একটা ডোবা মতো রয়েছে।…খুব স্বাভাবিকভাবেই আমি উত্তর দেই।

—বাড়ির পেছনটা একটু দেখতে পারি ।

সম্মতির অপেক্ষা না করে নিজেই তিনি সেদিকে যাওয়ার পথটা খুঁজতে চেষ্টা করেন; কি মনে করে হটাৎ বলে ওঠেন—থাক্, রাদার আপনার কথাতেই রিলাই করে নিচ্ছি। আচ্ছা চলি…। যেন কোন লং শটে ক্যামেরা ফেড আউট হয়ে যাচ্ছে। পর্দা জুড়ে এরপর কেবল মুখর শূন্যতা।

একসময় সাইলেন্স ক্র্যাশ। আমার বাড়ির পেছনের দরজায় দু' একটা আস্তে আস্তে টোকা! আঘাত এক সময় কাতর বর্ণের উচ্চারণে ফোঁটে—অচিন্ত্যদা. বৌ—দি,…। শরাহত কোন হরিণের শব্দ যেন পৃথিবী ছেড়ে যাওয়ার অন্তিম মুহূর্তে প্রাণ আঁকড়ে রাখার গভীর মমতা ব্যক্ত করে ডাকছে। খুব ঔৎসুক্য নিয়ে দরজা খুলি। ভিজে সপ্‌সপে গা একজন বিদ্যুৎগতিতে ঢুকে পড়ে ঘরের ভেতর। ভয়ার্ত ভাষায় বলে—লাইটটা অফ্ করুন।

দেখেই পরিস্কার চিনতে পেরেছি,—নবীনবাবুর ছেলে শাশ্বত। অনেকদিন হয় ওর একটা নূতন নাম হয়েছে শুনেছিলাম এক্সট্রিমিস্ট'। যে সময়কার কথা বলছি, সে সময় ঐ শব্দটাকে চিহ্নিত করা হয়েছে সাংঘাতিক, ডেঞ্জারাস, ভয়ঙ্কর, এ ধরনের যাবতীয় মানুষ-গ্রাহ্য ভয়াবহ বর্ণমালায়। ঐ শব্দটা কোন মহল্লার মোড়ে এসে দাঁড়ানো মানে পৃথিবীর সুরক্ষিত দিগন্ত টপকে একদঙ্গল বিভৎস বাইসন যেন হুড়মুড়িয়ে এসে এপ্রান্তে ঢুকে পড়েছে। শব্দটা রাজপথ দিয়ে হেঁটে গেলে পৃথিবীর সব সময়ের ঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়। একদল কাফ্রী দস্যু যেন মরু-ঝড়ের বেগে ধেয়ে আসে। রুদ্র তেজে জেগে ওঠে ভিসুবিয়াস। ষাঁড়াষাঁড়ি বান আছড়ে পড়ে উপকূলে। পাহাড় ফাটিয়ে গর্জে ওঠে দানবীয় ব্লাস্টিং।

শাশ্বত ভয়ঙ্কর শব্দের জীবন্ত বর্ণমালা, এখন আমাদের চোখের সামনে ;—মাঝরাতে আমাদের ঘরে। কিন্তু ও তো শুনেছিলাম 'এ্যাবস্কণ্ড'! ওর বেগবান তুই হাত না কি মৃত্যু তৈরীর মেশিন, ওর চোখের ঠিকরানো আলোয় না কি অনেকের মুখ শাদা ব্লটিং পেপার হয়, ওর সাক্ষাংকারে পৃথিবীতে না কি ভয়ঙ্কব নিশুতি রাত। তারপর এক সময় সেই রাত কলজে কাঁপিয়ে আকাশ বিদারী অট্টহাসে চিংকার করে।

শাশ্বতকে নিয়ে এ' সব অপ্রাকৃততায় আমার বিশ্বাস ছিল সামান্যই। অনেকদিন ওকে কাছ থেকে দেখেছি, চিনতাম, জানতাম। আদুরে আদুরে মুখ করে বৃষ্টিভেজা এক গোবেচারা ফুলগাছ যেন এখন টবের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে।

আচমকা বাতাস ঝাঁপিয়ে দৌড়ে এল এক ঝাঁক উন্মত্ত শব্দ। পুলিশ একটানা কোথায় ফায়ারিং করছে! খুব কাছাকাছি কোথাও হবে। বাঁধ দেওয়া নিস্তব্ধতা খানখান ভেঙে পড়ছে। বুঝি গুলি

খেয়ে মাটিতে ছিটকে পড়েছে। নিস্তব্ধতা আহত। গুটি গুটি উঠে দাঁড়াচ্ছে। দাঁড়াল কি? আবার অব্যর্থ নিশানায় যেন ওকে তাক করেই একটানা ছড়রা। দীপা দৌড়ে গিয়ে লাইটটা অফ্ করে দিল।

গুলি-খাওয়া নিস্তব্ধতা সুযোগ পেয়ে ঝাঁ করে এসে ঘরের মধ্যে হাজির। যেন প্রচণ্ড হাঁপাচ্ছে যন্ত্রণায়,—হয়তো কঁকাচ্ছে। অনেকক্ষণ পরে বেহুশ হয়ে সে বুঝি ঘুমাল!

অন্ধকারে বসেই শাশ্বত খুব চাপাস্বরে কথা বলে,—মা আর বাঁচবে না। তু'দিন অক্সিজেন চলেছে,—হটাৎ করে এক জায়গায় খবর পেলাম। কেন যেন জানি না, মাকে দেখার খুব ইচ্ছে হল।....হ্যাঁ, পিছ্‌টান অস্বীকার করা উচিত ছিল, পারলাম না।....

....শেষ অবস্থা পরিষ্কার। কথা বন্ধ হয়ে গেছে। বিছানার কাছে গিয়ে ডাকলাম—মা, মাগো....। কতদিন তো দেখি নি, ওমন করে ডাকি নি। চেনা স্বর শুনে চোখ খুললেন। মনে হল তাকিয়ে চেনার চেষ্টা করলেন। ঠোঁট তুটো কাঁপছিল। চোখের কোণায় জল চুইয়ে আসছিল। বুকে হাত বোলাতে বোলাতে জিজ্ঞেস করলাম—মা তোমার খুব কষ্ট, না মা? খুব কষ্ট?

বাবা হটাৎ কাঁপতে কাঁপতে কাঁপতে এসে খবর দিলেন মনে হচ্ছে, তোমার আর এখানে এক সেকেণ্ডও থাকা নিরাপদ নয়। পুলিশ বাড়ি ঘিরে ফেলেছে.... ।—শাশ্বত থামে।

পাহাড়ে উঠতে গিয়ে যেমন হাঁপিয়ে গেলে কোন ধাপে একটু থামা, বুক-হাঁপরে এক মুঠো অক্সিজেন, বাঁচার ফুল শুঁকে নিয়ে কলজের মধ্যে অনেকটা আকাশময় স্বস্তি,—সতেজতা ; তারপর আবার পথ চলা. শাশ্বতর আবার বলা শুরু। শুনতে পাই, একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে নিয়েছে।

....মার কাছ থেকে ঐ বিদায় শেষ বিদায় ছিল। কিন্তু বাবার....' কখনও ভাবি নি বাবাও অমনভাবে চলে যাবেন।

শাশ্বতর চোখে কি একটু বৃষ্টি। নবীনবাবুর মৃত্যুর স্মৃতি আমাকেও আদ্র করে। শাশ্বতর এক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে। খাঁ খাঁ বাড়িটার দরজা একদিন আবিস্কৃত হয়েছিল কয়েকদিন ধরেই বন্ধ ভেতর থেকে। অনেক ডাকাডাকির পর দরজা ভাঙা হল। কড়িকাঠে ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছেন নবীনবাবু। দেহটা দেখতে খুব বিভৎস হয়ে গিয়েছিল।

শাশ্বত এবার একটু সহজ স্বরে বলে—আপনার সঙ্গে তো সে-সময়ই শেষ দেখা হয়েছিল, তাই না? প্যারোলে কয়েক ঘণ্টার জন্য ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছিলাম। আপনার চোখ-মুখ থেকে সেদিন মনে হয় আমার প্রতি বর্ষিত হয়েছিল যা, তাকে সোজা কথায় বলা যায় থু থু; অচিন্ত্যদা, আপনার মন ছিল বুঝি সেদিন রাইফেল, চোখে ঘৃণা জ্বলছিল তীক্ষ্ণ বেয়নেট····

কথার মধ্যে প্রশ্ন ছুঁড়ি—ছাড়া পেলে কবে? আরো অনেক প্রশ্ন ভিড় করে আসে। ইচ্ছে করেই রাশ টেনে ধরি।

শাশ্বতর গলার স্বর এখন একদম স্বাভাবিক। উত্তর দেয়—লেফট ফ্রন্ট পাওয়ারে আসার পর পালিটিক্যাল প্রিজনারদের····

শাশ্বত, চোখের সামনে টাটকা কেনা যেন এক আকর্ষণীয় বই। পাতাগুলো খুব উল্টোতে ইচ্ছে করে; হাত ধরে হাঁটি—হেঁটে যাই। কিন্তু বুক থেকে এক দীর্ঘশ্বাস বাজে। ব্যথা মিলে এক সময় জিজ্ঞাসার উচ্চারণ,—সব হারিয়ে একদিন যাকে পেতে চেয়েছ,····হিসাব মিলিয়েছ? কি পেলে?····

ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতো শাশ্বতর চলে যাওয়ার উদ্যোগ। স্পষ্ট বুঝতে পারি এবার ও এড়িয়ে যেতে চায় আমাকে।

পায়ে গতি আনতে আনতে জিজ্ঞেস করে—বৌদি ভালো আছেন? রিণি? এখানে কোথায়? শুনেছিলাম কুচবিহারে আছেন? কোন না কোন ভাবে খবর পেয়েছি;—যাই, সুপারভাইজার হয়তো ওদিকে

খোঁজ করছেন। যেতে যেতে বাতাসে সবশেষে ছুঁড়ে দেয়—রাস্তা তৈরীর কাজ খুব জরুরী, একদম ফাঁকি-ঝুঁকি চ—লে—না····

ফেরার সময় বাসেই ফিরলাম। একটা বসার জায়গা পেয়েছিলাম। দুপাশে ছুটন্ত বন—পাহাড়—বাড়ি-ঘর—মানুষ, ধাবমান জগৎ····।

কতকাল আগে পড়েছিলাম। পঙ্‌ক্তিগুলো আপনা আপনি মনে উজ্জ্বল হয়। নিঃসীম অন্ধকারে ফোঁটে যেন মিটিমিটি তারা।

They never fail, who die
In a great cause. The block may soak their gore ;
Their heads may sodden in the sun, their limbs
Be strung to city gates and castle walls ;
But still their spirit walks abroad. Though years
Elapse and others share as dark a doom,
They but augment the deep and sweeping the rights
Which overpower all others and conduct
The world at last to freedom.....

বাস থেকে নামতেই দীপার উৎকণ্ঠা ভরা প্রশ্ন—কি ব্যাপার, এত দেরী ? কোথায় ছিলে ? বলতে গিয়েও বললাম না। কেন যেন এভাবেই বললাম—বন্যায় এক জায়গায় একটা বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম ওটা সারাই হচ্ছে····।

(দশ)

বেদনার বহমান স্রোত কি নদী ? বাঁকে বাঁকে বেদনার মীড় ভাঙার নাম কি হাহাকার ?

নলিনী বাউল আজ আর নেই। কি সুন্দর ক্ষেপাটে যে চেহারা ছিল,—গভীর জীবনবোধের সে পাঠ শেখাত।

বাংলার মাঠ-ঘাট যেন সহজ সরল গোবেচারা মানুষ। মানুষ যখন, মাথায় তো কিলবিল করতেই পারে অথবা মনের মধ্যে ঘাঁই মারবেই মাঝে মাঝে কিছু পাঁকাল প্রশ্ন। পড়ুয়ার মন তখন খুব উসখুস। তা পাঠশালা কই? বই কই? কোথায় বা হাতের কাছে ঐ ফণী পণ্ডিত, কি দীনু মাষ্টার?

যাদুকর রোদ তো ঐ যে হেঁটে যায়;—উদাস বাতাস সবখানে ঘোরে ফেরে, ছড়ানো সবুজ-ও কি অপূর্ব! অপার নীল-ও কত গম্ভীর! ধুলো-কাদায় পা ডুবিয়ে কালের মন্দিরা বাজাতে বাজাতে ঐ বুঝি আসছে বুকের মধ্যে এক অন্য ভুবন,—ওর-ই নাম নলিনীদা।····

ওসব কথা থাক। নলিনীদারা যে কবে মরে ভূত হয়ে গেছে····।

নদীর কথা হচ্ছিল, হচ্ছিল বেদনার কথা। নলিনী বাউল দোতারা বাজিয়ে গান গাইত—নদী রে তুই মোর চক্ষের জল···· ।

× × ×

সারাটা পথ রিণিকে বুকের মধ্যে জাপটে ধরে এনেছিলাম। আমার বুকের বাঁদিকে সচল হৃদপিণ্ড কত অক্ষম।

একটিবার, শুধু একটিবার আমি ওর কাছে নতজানু হয়ে ভিক্ষুকের মতো চেয়েছিলাম, ওর সচলতা অন্তত একটা দেশলাই-এর কাঠির মতো জ্বলুক, জ্বলে উঠুক মাত্র এক ফুলকি সচলতা। রিণির স্তব্ধ হৃদয় আবার জেগে উঠুক, নব জন্মে চোখ মেলুক মৃত এক প্রদীপ শিখা····।

····রিণি ঘুমিয়েছিল। বন্ধ দুই চোখ, নেভানো লুপ্ত আলো।

মং পং থেকে একদিন আমরা জিপে করে যাচ্ছিলাম শিলিগুড়ি। কয়েকটা বিপজ্জনক টার্ণিং, সুন্দর করোনেশন সেতু, আবার পাশে পাশে অতলান্ত খাদ, ভয়ঙ্কর বাঁকে ডেড স্লো স্পিড, অনেকক্ষণ এসব পার হওয়ার পর আমরা যখন সৃষ্টির আদিমূলের সাক্ষীদের অশরীরী রাজ্যে, দীপা বুঝি মনের খুশীতে গুনগুনিয়ে গান ধরেছিল—'এই

আকাশে আমার মুক্তি আলোয় আলোয়....।' জিপের ড্রাইভার দল বাহাদুরের পা-রাখা গ্রিয়ারে দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তির উল্লাস। পাশে বসা রিণি তার মাতৃভাষার সরসতা নিয়ে নানা মজাদার প্রশ্ন করছিল—দলকাকু, এখন কটা বেজেছে? সাড়ে দুটো? এখন 'খাঁজা-খানু কা বেলা?....

দল আড়াইটা না বলে সাড়ে দুটো, দেড়টা না বলে সাড়ে একটা, এ রকম বলায় রিণির কি খিলখিল হাসি। দুপুর না বলে 'খাঁজা খানু কা বেলা' বলাতেও দারুন সে মজা-পাওয়া। অন্তরঙ্গ ভাবেই দলকে সে জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দলকাকু, তুমি কখনো কলকাতায় গ্যাছ? দলও সরস ভাবে জবাব দেয়—হুঁা, ম কলিকাতাম্মা গগাথিও। দলের ভাষা ও বাচনভঙ্গীতে রিণিতে ফেটে পড়ে সোনা-ঝরা হাসি। আমার কানেও ঐ 'গগাথিও' শব্দটা বড়ো সৌন্দর্যের মাধুরী ছড়ায়।

দুরন্ত জিপ আরো উচ্ছলতায় ভরে।

বনের কোলে পাহাড়ী বস্তীর নাম তেরো মাইল,—এগারো মাইল, —সাত মাইল····। নিপুণ হাতে দল বাহাদুর যন্ত্র-ঘোড়ায় নীরব কশাঘাতে গতি জয়ের রোমাঞ্চে মাতে। দূরান্তে এক কালো বিন্দুর উদয়। কালো বিন্দু ক্রমশ বড় হয়, সামনে পথের দিগন্তে হটাৎ ভেসে ওঠে একটা ট্রাক। স্পষ্ট টের পাওয়া যায় নক্ষত্রবেগ সে-ও সঙ্গী করেছে। দলবাহাদুর সংযত বেগে আপন পথ ধরে নেয়। গতির ঝড় তুলে প্রকাণ্ড ট্রাক সামনে। আসছে,—সে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে আসছে····। কিন্তু একী! ডানপাশে রাস্তা তো ছেড়ে দেওয়া আছে। হে ...ই, ও যে মুখোমুখি ছুটে আসছে। তারস্বরে আমি চিৎকার করে উঠি, দ—ল····,দল প্রাণপণে উন্মত্ত দানবের পথ থেকে আমাদের গাড়ি ঘোরায়। কিন্তু বিকট সে দানব আমাদের জীপের একধারে প্রচণ্ড আঘাতে ভীষণ সংঘর্ষ তোলে। আমাদের জিপ কাত হয়ে রাস্তার ধারে ছিটকে গিয়ে গড়াতে গড়াতে অবশেষে এক গাছে আটকে যায়।

মুহূর্তে সব কিছু তালগোল পাকিয়ে যায়। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে। কিসের যেন একটা ভয়ঙ্কর শব্দ শুনেছিলাম! কি যেন মাথার ওপর একটা দারুন আঘাত করে! ঘুরছে সব কিছু—প্রচণ্ড ঘুরছে। চোখে কালো, নীল, শাদা আলোর কম্পমান নানা বিদ্যুৎ তরঙ্গ, দ্রুত জগৎ লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে—সব কিছু ঝাপসা—ঝাপসা। চোখের সামনে ফেনা ফেনা আলো। এক সময় সব অন্ধকার। অন্ধকার নিস্তব্ধ স্থির।····

····ডুবো মানুষ যেন জল কেটে আবার এক সময় ভেসে অন্ধকার—চাপা অন্ধকার ক্রমশ ফিকে,—চোখের ওপর দাপাদাপি করছে কারা!—আচমকা কোথা থেকে লাফিয়ে উঠল একটা আলোর রেখা। যেন কোথাও সে লুকিয়েছিল। একটা দেয়াল টপকে যেন কে দ্রুত হারিয়ে গেল,—অন্ধকারে আত্মগোপন। কানের মধ্যে একটা ঝিনিঝিনি শব্দ ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। মস্তিষ্কে হঠাত একটা আঘাত; —খটাস শব্দে কে যেন বন্ধ কোন দরজার কপাট খুলছে। চোখের সামনে এ কী, এক অসহ্য আলোর বন্যা! খুব গরম লাগছে। প্রচণ্ড তাত। চোখ বুজি। চোখের পর্দা কি মিহি সুতোর বুননের কোন জাল? নানা রঙ বাহার ধরা-পড়া মাছের মতো সেখানে চলছে-ফিরছে—ফিনফিন।

একটু চুপ থেকে আবার চোখ মেলি। কুয়াশা কুয়াশা আলো,—শাদা ছাদ,—ঝুলন্ত পাখা,– দূর আকাশে ধূসর পাখীর ডানা; —ক্রমশ ভোরের আলোর মত ঘোলা জল থেকে রোদ মেখে যেন কোন চরা জেগে উঠছি। ধাতস্থ হয়ে চোখ নামাই। সারি সারি ক্যাম্পখাট—লোকজন—রোগী। শোওয়া থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠি, আমি শোয়ানো, ধবধবে বিছানা—পায়ের কাছে কম্বল—মাথার পেছনটায় যেন শেকল। দ্রুত সেখানে হাত দেই, ব্যাণ্ডেজ!—

হাতে টনটন ব্যথা ! —পাশে স্যালাইন-স্ট্যাণ্ড ! —ঝাঁঝালো ওষুধের গন্ধ ! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করি, দীপা—শ্যামল—রি—ণি,···· ।

একজন নার্স দ্রুত ছুটে আসেন । শান্তভাবে বলেন—মিঃ রায়, অধৈর্য হবেন না, আপনার লোকজন সব কাছেই আছেন । দাঁড়ান ডেকে দিচ্ছি ।

····সব কিছু মনে পড়ে যায় । আমি পেছন থেকে নার্সকে বলতে চেষ্টা করি—রিণি···· । প্রায় ছুটতে ছুটতে দীপা, শ্যামল, অতীশ, নন্টুরা ছুটে আসে ; আমি পাগলের মতো জিজ্ঞাসা করি—রিণি কোথায় ? রিণি···· ?

দীপা বিছানার একদম কাছে এসে দাঁড়ায় । শ্যামল আস্তে আস্তে বলে । বলতে বলতে এক-আধবার ঢোঁক গেলে । তারপর ক্ষীণস্বরে বলতে থাকে—রিণি ভালো আছে····।

—কিন্তু কোথায় সে ?

—সার্জিকাল ওয়ার্ডে ।

উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে আমি জিজ্ঞাসা করি—কেন রিণির কি হয়েছে ? আমাকে প্লিজ ওর কাছে নিয়ে চল ।

শ্যামল আস্তে আস্তে বলে—সেদিন আপনার ও রিণিরই চোট লেগেছিল সবচেয়ে বেশি । আপনারা দুজন সেন্সলেস হয়ে গিয়েছিলেন । ····রিণির কোমরের ইনজুরি একটু ফেটাল ।····ডঃ সেন খুব যত্ন নিয়ে দেখছেন । ভয়ের কিছু নেই ।····

····সারা গা রিণির ব্যাণ্ডেজ মোড়া । করুণ মুখ নিয়ে চেয়ে থাকত । আঘাত যে খুব গুরুতর সংশয় নেই । প্রাণে যে বেঁচে গেছে বড় কথা ।

আমি দ্রুত সেরে উঠছিলাম । কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় দিন কয়েকের মধ্যে রিণির পাশাপাশিই আমার বেডের ব্যবস্থা হয় । সপ্তাহ দেড়েক বাদে আমি ছাড়া পেলাম । রিণি-ও মনে হয় আঘাত

কাটিয়ে উঠছে। ডঃ সেন, ডঃ ঘোষ খুব দরদী। অভয় দিয়ে বলতেন—একদম ঘাবড়াবেন না।

আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, অনেকেই প্রতিদিন আসত। এক সহকর্মী পলাশবাবুর বাড়ি জলপাইগুড়ি টাউনে। দীপার সাময়িক আস্তানা এখন ওখানেই। দীপা পলাশবাবুর স্ত্রীকে নিয়ে প্রতিদিন আসত। ঘরে যেতে মন চাইত না। দল বাহাদুরও একটু জখম হয়েছিল। প্রতিদিন বিকেলে পথিক ঘড়ির কাঁটা হাঁটতে হাঁটতে যখন চারটা-পাঁচটায়, রিণির পায়ের কাছে বিছানায় এসে বসত নির্বাক এক পাথরের মূর্তি। রিণির চোখাচোখি হলে ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ত প্রসন্নতা। প্রায় আটটা-নটা।····আমি শান্তভাবে বলতাম—দল, আজ যাও। ও বলা মাত্র নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াত। রিণির মাথায় একবার হাত বুলিয়ে নিয়ে বলত—খোকি, তুম শো যাও, হাম কাল জরুর আয়েঙ্গে····।

আমি ছাড়া পাওয়ার পর পালা করে রিণির কাছে কাউকে না কাউকে থাকতেই হত। এক অসহায় শিশু। এর আগে দু' দণ্ডও যে আমাদের চোখের বাইরে হয় নি। দীপা প্রথম প্রথম খুব ভেঙে পড়েছিল। আর্তনাদ করে বলত, রিণিকে ছাড়া আমি বাড়ি গিয়ে কিছুতেই থাকতে পারব না। না, না, আমাকে এখানে একটু দয়া করে থাকার ব্যবস্থা করে দাও....।

প্রায় অনেকটা সে রকমই বন্দোবস্ত হয়েছিল। মায়ের চোখের জল নইলে যে জমাট পাথর হয়।

দিনভর রিণির দেখাশুনা দীপা করত। রাত ভাগ করে নিয়েছিলাম আমি। মাঝে একদিন রিণি হঠাৎ অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অবুঝ শিশু। ভেতরে কি কষ্ট হচ্ছে মুখ ফুটে কতটুকুই বা বলতে পারে! তবু দেখেছি ভাষা যেখানে অক্ষম, অন্য কিছু একটা থাকে; প্রকাশ বুঝি কদাচিত-ই শেকল পরে।

বোঝা যাচ্ছিল বুকে কোথাও সে দারুন যন্ত্রনা বোধ করছে। প্লাসটার কেটে একসুরে করা হল। চিকিৎসা বুঝি আবার নূতনভাবে। মনে হল, তাতে কাজ দিচ্ছে। উপশমের স্বস্তি চোখে ধরা পড়ে।

....দেখা-শুনার কাজ স্বাভাবিক ভাবেই কিছু বেড়েছে। রাতভর প্রায় অজাগর আমি। মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে কয়েক মুহূর্ত হয়তো দাঁড়াই। সামনে কোজাগরী পূর্ণিমা। পুজো কবে কেটে গেছে। জ্যোৎস্না কুয়াশার পর্দার আড়ালে আবছা আলোময়। শৈল শহরের মাথায় গতায়ু শরতের চাঁদ যেন জ্বলে কুহেলি ঘেরাটোপে শীতার্ত শহরে শেষ রাতের নিসঙ্গ ফ্লুরোসেন্ট আলো। জ্যোৎস্না যেন বনেদী বাড়ির চিকের আড়ালে বসে থাকা অন্তপুরের নারী। বেআব্রু হতে তার মানা। নিঝুম জ্যোৎস্না রাত, আমার তখন মনে হয়, নীরব চোখে তাকিয়ে আছে দীপা। এক বেদনার্ত জননী বড় নিঝুম, —যন্ত্রনাক্ত ; তার সন্তান নিদারুন কষ্ট ভোগের পর এখন শান্তিতে ঘুমোচ্ছে। সচেতন মা, নড়াচড়াতেও খুব নম্র-ধীর,—পাছে রিণির যদি ঘুম ভাঙে—অতর্কিত ঘুম ভেঙে যদি সে জেগে ওঠে!

দ্বাদশীর রাতে আকাশে আলোর আভা ছিল, দিগন্তে একধারে ছিল কালো মেঘের একখণ্ড জটা। এক সময় সে মেঘ ঝাঁকড়া চুলে মাথা নাড়িয়ে বেশ ডাকাবুকো। রাত আরো গভীর। আকাশ সম্পুর্ণ কালি-ঝুলি মাখা। তারপর যা হওয়ার তাই। এক উদ্ধত কাপ্তেন, নির্দয়তার জীবন্ত মূর্তি।

শেষরাত থেকে মুষলধারে বৃষ্টি। সকাল হওয়ায় আকাশের অসামাজিক আচরণ বুঝি কিছুটা সংযত। রাগী দারোগার মতো রোদ তারপর যখন এক সময় অতর্কিতে আসে, বৃষ্টি তখন ফেরারী। অবশ্য বেশী দূর যায় নি সে, এদিক-সেদিকেই কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে আছে। ওপরে আকাশ থম-মারা, চাপা ক্রোধ জমাট বাঁধলে যেমন হয় তেমনি গুমোট। দার্জিলিং-এর ভ্রমণকারীরা দুপুরে

নামলেন। বললেন, কদিন ধরে ওপরে খুব বৃষ্টি হচ্ছে। আরো উত্তরের খবর, জল আর পৃথিবীর মধ্যে যে আকাশের বাঁধ আছে তা, চৌচির হয়েছে সেখানে সাঙ্ঘাতিক ভাবে।

মহল্লায় দাঙ্গা, খুন বা অসামাজিক কোন ক্রিয়াকর্ম ঘটে যাওয়ার পর যেমন স্থানীয় বাতাসে জড়িয়ে থাকে উল্লম্ব আতঙ্ক বা উত্তেজনা, তারমধ্যে সঙ্গীন উঁচিয়ে সান্ত্রীর ব্যস্ত টহল বা ওদের পিকেটিংয়ে থাকা, অতএব দুস্কৃতকারীদের সাময়িক আত্মগোপন; অনেকটা চালু প্রবাদের মতো, বামুন গেল ঘর, লাঙল তুলে ধর, প্রহরীরাও যথাস্থানের দিকে তারপর এক সময়ে ঘোরে, দুর্বৃত্ত দলের আগমন বা লীলা-খেলাও যথাস্থানে শুরু হয় যথারীতি এবং যথাপূর্বং।

বিকেল মেলানোর আগে হেলমেট আঁটা কড়া পোষাকের রোদ ধীরে ধীরে বিদায় নিয়ে চলে যায় নিজস্ব ডেরাতে। কালো জামা গায়ে আর মুখে কটা রঙের মুখোশ এঁটে চারিদিকে দাপাদাপিতে মেতে ওঠা আবার বিকট অন্ধকার। কত হিংস্র সে, বৃষ্টি প্রমাণ রেখে চলে তার সশব্দ সাক্ষ্যরে।

....সেদিন দীপা এসেছিল রিণির কাছে যথানিয়মে সকাল থেকেই। আকাশের ভাবগতিক ভালো নয়। দুপুরের স্নান-আহারের পালা চুকিয়েই আমিও পলাশবাবুর বাড়ি থেকে হাসপাতালের দিকে রওনা দিই একটু বাদেই। যাবার সময় পলাশবাবুর স্ত্রীকে বলে যাই,—আজ আর বিকেলে যাবেন না। আকাশ ভারী গুম মেরে আছে। আমি গিয়েই দীপাকেও চেষ্টা করবো তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিতে। মনে হচ্ছে আকাশের ভাবগতিক সুবিধার নয়....।

হাসপাতালে আসতে আসতে দেখলাম শরত অথবা হেমন্ত সেজেছে এলোকেশী শ্রাবণী। থাবা থাবা কালো রঙে কলঙ্কিত পৃথিবীর অনন্যা প্রতিমার মুখ। এখানে সেখানে নীচু জায়গাগুলোতে

কোথাও কোথাও ইতিমধ্যে জল জমে গেছে। আবহাওয়া প্রচণ্ড মেঘলা।

দীপাকে জোর করে বাসায় পাঠালাম। ঘণ্টা খানেক বাদেই অঝরে বৃষ্টি নামল। চারদিকে খুব অন্ধকার। মেঘ আর সন্ধ্যার যুগলবন্দী। আবহে একটানা বেজে চলেছে এক ঘোর শব্দময়তা। খুব চিন্তা হচ্ছিল, দীপা ঠিক ঠিক মতো বাসায় ফিরল তো!

বাইরে পৃথিবী জুড়ে চলেছে মহাপ্রলয়। তোলপাড় জগৎ। রুদ্ধ ঘরে সব কিছু ধূসর কুয়াশাময়। ঝুলন্ত আলোগুলো জ্বলছে নিভু নিভু-মুমূর্ষু তারা। কেন জানি না মন কেমন করছে। বুকে কিরকম ছমছম ভাব। রিণির বিছানায় আরো সংলগ্ন হয়ে ওর পাশে বসে থাকি।

বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, সঙ্গে বিকট আওয়াজ। বিকটতায় কানে যেন তালা লাগে। রিণির কানে একটু তুলো গুঁজে দিই। শব্দের তীব্রতায় পাছে ওর ভয় লাগে।

রিণি খুব ক্ষীণস্বরে প্রশ্ন করে—বাবা, বাইরে কিসের আওয়াজ?

কপালে হাত বোলাতে বোলাতে উত্তর দিই—খুব বৃষ্টি হচ্ছে, ভয় নেই, তুমি চোখ বন্ধ করে ঘুমাও, এই তো আমি পাশেই আছি.... ।

রিণি মন্ত্রমুগ্ধের মতো চোখ বোজে। কিছুক্ষণ পরে আবার ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা—মা কোথায়?

—মা বাসায় গেছে। বৃষ্টির আগেই চলে গেছে। তুমি ঘুমোতে চেষ্টা কর। মা কাল সকালে আসবে।

রিণি চোখ বোজে, চোখ খোলে। তাকায় আমার দিকে। চোখে কি অসহায়তা। (আমার চোখেও কি নয় তা!) রিণি হঠাৎ কাতরভাবে আব্দার করে—বাপি, আমায় একটু কোলে নেবে? আমি কতদিন কোলে উঠিনি.... ।

জোরে দীর্ঘশ্বাস ফেলি। ভারী গলায় সান্ত্বনা দিই—আজ না মা, তুই ঘুমো, তোকে অন্যদিন কোলে নেব।....

রিণি করুণভাবে চেয়ে থাকে। বুঝি ও কাঁদছে। এক সময় নীরবে চোখ বোজে। আমি উজাড় স্নেহে ওর কপালে—মাথায় হাত বুলাই। মনে মনে চিন্তা করি; খুব খারাপ লাগে, সত্যিই তো, কতদিন ও আমাদের কোলে ওঠে নি !

....কটা বাজে ? ঘড়ি দেখি। প্রায় নটা। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া কোথাও বিশেষ আর কোন জাগতিক সাড়া-শব্দ নেই। মাঝে মাঝে দু' একজন হাসপাতাল কর্মীর ব্যস্ত-সমস্ত গলা ভেসে আসে। রোগী-রোগীনির দু' চারজনের আর্তনাদ। সন্ধ্যে থেকে লক্ষ্য করছি, সেবিকা কয়েকজনকেই বিভিন্ন ওয়ার্ডে ছুটোছুটি করতে। প্রবল বর্ষণ ভেদ করে চিকিৎসকরা বোধ হয় এখনো সবাই আসতে পারেন নি।

একবার ভেজানো দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিলাম, চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। সোঁ সোঁ করে বইছে ঝড়ো বাতাস। দুর্যোগের তীব্রতা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করি। হঠাৎ কিছুটা শিউরে উঠি। দপ্ করে আলো নিভে যায়। চমকে ওঠার কথাই। বাইরে ঘন দুর্যোগ। এ' অবস্থায় আলো নিভে যাওয়া।....

একলহমায় চারিদিক থেকে একটা জটিল আর্তনাদ ভেসে আসে। আলোহীনতায় ভয় পেয়ে নানাজনের ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি চলে। আমি টর্চটা জ্বালাই। রিণি ঘুমোচ্ছে। আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এদিক-ওদিক ছুড়ি। মনে হয় আলো জ্বালানোর চেষ্টা-চরিত্র চলছে। আধশোয়া হয়ে রিণির পাশে বসে থাকি। চাপা গোঙানি মাঝে মধ্যে ভেসে আসে।

হঠাৎ একটা ছায়াছবির দৃশ্যের কথা মনে পড়ে যায়। কেন যে যায় জানি না। ছবির নাম হাঁসুলি বাঁকের উপকথা।....

এমনি জমাট অন্ধকার। অবশ্য সে অন্ধকার আলো জ্বালাবার সামর্থহীনতায় সৃষ্ট। দারিদ্র্যের রাহুগ্রাস সেখানে ভয়াবহ।....

....কাহাররা অন্ধকারে জন্মায়, অন্ধকারে থাকে, অন্ধকারেই মরে। মারা যাচ্ছে পরাণ। কালরাত্রিতে তার শিয়রে ক্ষীণ শিখায় নিভু নিভু এক প্রদীপ। তেলহীন সলতে দপ্ করে একবার শেষবারের মতো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে নিভে গেল। গোঙানিতে কোথা থেকে ভেসে আসে একটু আলোর জন্য আকুতি,—একটু আলো জ্বালানো যে একেবারে অসম্ভব। তেল কই? পয়সা কই? যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন দুমূ´ল্য। অভিশপ্ত পরিবেশে অন্ধকারে পাগল ছড়া কেটে গেয়ে ওঠে,—"আলোর তরে ভাবনা কেনে হায় রে।/অন্ধকারেই পরাণপাখী সেই আশেতে যায় রে।/চন্দ, সূর্য, লম্ফ, পিদিম তাইরে/নাই রে, নাই রে!/না থাক্, আছে একজনা ভাই,/এগিয়ে এসে হাতটি বাড়ায়/দুই চোখে তার দুইটি পিদিম আঁধারে রোশ নাইরে,/আলোর তরে ভাবনা কেনে হায় রে।"....

কিন্তু আমি আচমকা আঁতকে উঠি, অন্ধকারে আমার স্মৃতি পথে এ দৃশ্যের আগমন কেন? মন নানা কারণে খুব দুর্বল। এক অব্যক্ত আশঙ্কায় বুক দুরু দুরু করে। অন্ধকারে রিণির বুকে হাত দেই। না, বুক ওঠা-নামা করছে। অলুক্ষণে চিন্তায় নিজের মধ্যে বড়ো অনুতাপ জাগে।

রাত ক্রমশ গভীর হয়। দুর্যোগের তীব্রতাও বুঝি চরম কোন লক্ষ্যের মুখে যাত্রী। এর মধ্যে এক দুঃসংবাদ, আলো জ্বলবে না। ট্রান্সমিশন লাইনে কোথাও বিপর্যয় ঘটেছে। মন খুব কাঁপছে। একটা ভয় যেন দূরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি খুব হাসছে।

হঠাৎ শুনতে পাই তার ভয়াল অট্টহাসি। কখন একটু তন্দ্রাছন্ন হয়ে পড়েছিলাম। সজাগ হয়ে শুনতে পাই এক ভীষণ হট্টগোল। প্রচণ্ড আর্তনাদ—জল,—বন্যা। ভালো করে কিছু বোঝার আগে

তাকিয়ে দেখি—কি সাঙ্ঘাতিক, ঘরময় হাঁটুজল। ভয়ে দেহে শিহরণ খেলে যায়। বুঝি স্তম্ভিত, শরীর অসাড়।

চারিদিকে ছুটোছুটি। অন্ধকারে আকুল আর্তনাদ। রিণিকে দ্রুত কোলে তুলে নিই। চিৎকার করে ডাকি—নার্স, ডাক্তার—কে কোথায় আছেন—কেউ শুনতে পাচ্ছেন ?....

জল বিছানা ছুঁয়েছে। রিণিকে কোলে তুলে বিছানায় উঠে দাঁড়াই। গলা ফাটিয়ে আকুলভাবে ডাকি,—শেফালীদেবী, কুন্তলাদেবী, গগণ, বোসবাবু, মিঃ গুহ, মগনথাপা, ক্ষেত্রীলাল ....। অন্ধকারে ঐ বুঝি টর্চ জ্বেলে কারা যেন এগিয়ে আসছেন! বিছানায় দাঁড়ানো আমার হাঁটু বেয়ে ঠাণ্ডা জল, যেন হিমেল এক বিকট সরীসৃপ ওপরে উঠছে। রিণি ভয়ার্ত আর্তনাদে ডাকছে বাপি—বাপি, মা,—মা,....।

অসহায়ভাবে বুকের মধ্যে চেপে ধরছি রিণিকে। চেপে ধরেছি, প্রাণপণে বুকে চেপে শক্ত করে। কাঁদছি! হ্যাঁ আমি কেঁদে কেঁদেই ডাকছি—শুনছেন,—কেউ শুনছেন, দয়া করে....

হ্যাঁ, ঐ তো অনেকে আসার চেষ্টা করছে'ন—অনেকে। সাড়া দিচ্ছেন। নাম ধরে চেঁচিয়ে ডাকছেন আমাকে,—অ-চি-ন্ত্য বা-বু,....

জল আমার কোমর ছাড়িয়ে সড়্ সড়্ উঠছে আরো উর্দ্ধে। জড়িয়ে ধরছে এক ভারী শেকল। ভয়ঙ্কর অক্টোপাশ। কি করব ? আমি এখন কি করব ? আমি রিণিকে কাঁধে চাপিয়ে নিই। উঁচুতে, —সাধ্যমত উঁচুতে তুলে ধরতে চেষ্টা করি। কিন্তু একি রিণি কি নড়ছে ? ওর বুক কি ধুক্-পুক্ করছে ? ওর দেহ এত আলগা-আলগা কেন ? হাত বুঝি ঝুলছে শিথিল। ঝুলে পড়েছে....। ভেঁউ ভেঁউ করে কান্নায় চিৎকার করে ডাকি—রি-ণি, মা, আমার মা মণি,....

*　　*　　*　　*

রিণির দেহটা নিমেষে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। না; আমি পাগল হই নি। বুকের মধ্যে শুধু বুঝছিলাম, দলা পাকানো রক্তের মতো একটা কান্না—হু হু কান্নার একটা শক্ত ডেলা,—আমার বলতে ইচ্ছে করছিল,—মা মণি, তুই আমাকেও নে, তোর সঙ্গে আমাকেও নে.... ঐ চিতায়····।

একসময় কে যেন বলল—চিতায় জল ঢালতে হবে। মন্ত্র চালিত হয়ে কলসী করে জল তুলে আনি। ঢালতে যাই, রিণি যেন বলে ওঠে,—বাপি, আবার জল ?

হাত থেকে সশব্দে কলসী খসে পড়ে। দ্রুত এসে কে আমাকে ধরে নেয়।

....রিণি ভেসে যাচ্ছে—ভেসে যায়,—ভেসে গেল। চোখের জল শেকলে আমি রিণিকে বৃথা বাঁধতে চেষ্টা করি। তিস্তা, করলা, মহানন্দা আমার বুকে ডাকাতি করে যায়।

আমার ও দীপার নাম বোবা পাথর। লুট হয়ে গেছি আমি—সে—আমরা।

(এগার)

পিতার কোলে প্রিয় সন্তানের মৃত্যু। রিণি আমাব হাতের ওপরেই শেষ নিশ্বাস ফেলেছিল।

আমি এর জন্য দায়ী করেছিলাম জলকে। আমার রিণিকে খুন করেছে সে। খুনী জল। বর্বর ঘাতক।

প্রথম প্রথম এত কষ্ট হত,—অনেকেই ভেবেছিল, আমি পাগল হয়ে যাব। বিশেষ করে দীপার মুখের দিকে তাকালেই আমার মনে হতো, আমিই অপরাধী। শুধু একটি রাত, একটা নিষ্ঠুর রাতকে আমি ঠেকিয়ে রাখতে পারি নি। রাত কেটে ভোর হওয়ার আগে মৃত্যু রিণিকে ছিনিয়ে নিয়ে গা ঢাকা দিল।

যদি সেদিন হাসপাতালে দীপা থাকত,—দীপা তো সেদিন বাসায় আসতে চায় নি,—কেন আমি ওকে জোর করে বাসায় পাঠিয়ে দিলাম, —বাইরে দুর্যোগের তো প্রচণ্ড তীব্রতা ছিল, কেন আগে আমি সতর্ক হই নি,—সার্জিকাল ওয়ার্ড গ্রাউণ্ড ফ্লোরে, রিণিকে সময় মতো নিরাপদে শিফট্ করে নিয়ে যাওয়া অসম্ভব ছিল কি,—এ সব প্রশ্নগুলো আমাকে কতদিন চেপে ধরেছে, বোধ হয় এখনো ধরে। ইংরাজী শব্দটা এখানে যথার্থ, প্রতিমুহূর্তে এসব জিজ্ঞাসা আমায় 'হন্ট' করে চলে।

কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আমি। যেন শামলা গায়ে কঠোর এক ব্যারিষ্টার সচিৎকারে আদালত কাঁপিয়ে সওয়ালের শেষে ফেটে পড়ছে আমার দিকে—প্রশ্নগুলোর আপনি উত্তর দিন....। গুঞ্জন মুখর আদালতের দিক-দিগন্ত থেকে ধ্বনিত প্রশ্ন—ফিসফিসানি, হ্যাঁ, হ্যাঁ জবাব চাই, জবাব দাও....।

আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি শ্রবণ পথ রুদ্ধ করতে। নতজানু হয়ে বসে দুহাতে দুকান চেপে ধরছি, যেন ওখান দিয়ে প্রবেশ করবে ভয়ঙ্কর তপ্ত লোহার শলা। অসহায়তায় কুঁকড়ে গিয়ে বলে উঠি আচমকা চিৎকার করে—না, –না....

তারপর খুব কষ্ট হয় দম নিতে, পা টলতে থাকে, হাত অসাড় হয়ে আসে, মাথা কেমন ঝিমঝিম করে, চারদিক থেকে অন্ধকার গুটি গুটি এগোতে থাকে; হাঁফাতে হাঁফাতে আমি বলি,—হুজুর, বিশ্বাস করুন....আমি....।

আটষট্টির জলপাইগুড়ির বন্যার আকস্মিকতা ছিল অকল্পনীয়।

কিন্তু আকস্মিকতাহীন্ কি কোন দুর্যোগ? কি বন্যা-প্লাবন, খরা যত আকস্মিকতাময়, ততই কি ভয়ঙ্কর নয়?

কিন্তু রিণিকে নিয়ে দগদগে হু হু ব্যথা যখন ক্রমশই হয়ে যাচ্ছে স্মৃতি—ফ্রেমে বাঁধা ছবি—ছবিময় স্মৃতি বা স্মৃতিময় ছবি, একদিন মনের

মধ্যে এক গভীর প্রশ্নের অবতারণা।—প্রশ্নটা জেগে ওঠে এক-রকম সহসা ; —বন্যা কি দুর্ঘটনা ? এক এ্যাকসিডেন্ট ?

এতদিন তো ওকে জেনেছি বিধাতার অভিশাপ। ও প্রকৃতির চরম রুদ্ররোষ।

পৃথিবী তোলপাড় করে বৃষ্টি নামে। আকাশ সমুদ্রবর্ণ। সমুদ্র হয় আকাশ। প্রলয় জলধিতরঙ্গে হারিয়ে যায় তামাম পৃথিবী।

উল্টে যেতে শুরু করে কাহিনী-কিংবদন্তীর মলাট। বাইবেলের মহাপ্লাবনের বিবরণে নোয়ার কাহিনী ; —ঈশ্বর বললেন, 'যে মানুষকে সৃষ্টি করেছি তাকে বিনষ্ট করে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলে দেব আমি মানুষ, পশু, লতাপাতা, আকাশের পাখি, সবকিছু।'

নোয়ার কাহিনীতে আছে, 'পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার পর ঈশ্বরের খুব অনুতাপ হয়েছিল।' নোয়া এবং তার আশ্রিত ছাড়া সকলকে মুছে ফেলতে তিনি সৃষ্টি করলেন মহাপ্লাবন।

"....চল্লিশ দিন, চল্লিশ রাত বৃষ্টি ঝরে পড়ল পৃথিবীতে....জল বেড়ে উঠে ভাসিয়ে তুলল সেই (নোয়ার) জাহাজকে....অন্তহীন জলরাশি জমল পৃথিবীর উপর। আকাশের নীচে উঁচু হয়ে ছিল যত পাহাড়-পর্বত সব ডুবে গেল জলের নীচে। পনেরো হাত উঁচু হয়ে জমে রইল জল....পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী হল বিনষ্ট। শুধুমাত্র বেঁচে রইলেন নোয়া আর জাহাজে যারা ছিল তাঁর সঙ্গে।"

....হিন্দু পুরাণের মহাপ্রলয় ; —পৃথিবীর কত না রূপকথা ; —সবখানেই এক কথা, বন্যা-প্লাবন বিধাতার রোষবহ্নি।

....দু' নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল, গ্রীক ভাষায় যা মেসোপটেমিয়া,—ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস তীর, সেখানেরও সভ্যতায় সুমেরিয়ানরা পোড়া ইটের তৈরী জিগুরাত বা দেবস্থানে এই বিশ্বাস নিয়ে জানাচ্ছে—বন্যা-প্লাবনের পেছনে আছে এক অদৃশ্য শক্তির অসন্তুষ্টি।

....মিশরে বৃষ্টি হয় কদাচিৎ। ওখানে বর্ষা বলে কোন ঋতু নেই।

আদতে মিশর মরুর সন্তান, ওকে বাঁচিয়েছে নীলনদ। বছর বছর নীলে বন্যা আসে। এখানে বন্যা অবশ্য ঈশ্বরের কোপ-দৃষ্টি নয়। তবে বিশ্বাস একই রকম, দেবাদিদেব 'রা'র অনুগ্রহেই বন্যা-প্লাবন। এখানে পুজো পায় জলহস্তী। বন্যার আবাহনকারী সে।

....সিন্ধুতীরের সভ্যতা সম্ভবত ধ্বংস হয়েছিল যে সব কারণে, বন্যা-প্লাবন তার অন্যতম। সিন্ধু নদ, নাম পরিচয়ে পুরুষ, নানা নদী সমন্বয়ে সন্নিহিত ভূভাগকে সে করেছে জলে জলময়। সার্থকনামা সিন্ধু। এরই একটি লতাপাতার অঙ্গাঙ্গী নদীর নাম ইরাবতী। ইংরাজীতে যাকে বলা হয় রাভি। ইরাবতীর সন্তান ঐরাবত।

পৌরাণিক মতে অষ্ট হস্তী আট দিকের রক্ষক। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সর্বভৌম, সুপ্রতীক। এদের মধ্যে ঐরাবত প্রধান। ঐরাবত নামের মধ্যেই জল। ইরা -- দুধ, জল বা তরল পদার্থ। সৃষ্টির আদিতে গরুড় যখন ডিম ভেঙে বেরোলো, ব্রহ্মা সেই ডিমের খোলার দু' ভাগ দু' হাতে নিয়ে সামগান করলেন। তার-ফলে আটটি হাতী ও আটটি হস্তিনীর জন্ম হল। ডান হাতের ভাগ থেকে ঐরাবত ও অন্য হাতীরা বেরোল। বাঁ হাতের ভাগ থেকে যাদের জন্ম তার মধ্যে ঐরাবত-পত্নী অভ্রমূ প্রধান। ঐ আদিম আট হাতীই বিশ্বের দিকপাল। ওদের শুঁড় ও মাথা হেলানো-দুলানোর ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর নানা বিপর্যয়।

....চীনের উপকথায় বলা হয়েছে—আগে বিশ্বজগতে পৃথিবী-সূর্য-চন্দ্র কিছুই ছিল না। সে সময়ে পান্‌কু নামে এক অতি মানব জন্ম নিলেন। চীনা ভাষায় পান্‌কু কথার অর্থ 'প্রথম মানুষ'। তিনি আঠারো হাজার বছর বেঁচে ছিলেন। তিনিই চন্দ্র-সূর্য-গ্রহতারা-আকাশ সৃষ্টি করেন। তাঁর মাথা থেকে সৃষ্ট হয় পাহাড়-পর্বত, তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে মেঘ ও বায়ু, গলার আওয়াজ থেকে বজ্র, দেহরস থেকে জল, তাঁর শরীরের অণু-পরমাণু থেকে জীব-জগৎ। একটি উপকথায় আছে বন্যা বা প্লাবন তার চোখের তরল ক্রোধ।

....পর্জন্য দেবের সন্তুষ্টি বিধানের পেছনে আবহমানকালের এই একই বিশ্বাস। আর্যীয় ঐশীভাবনায় জল বা মেঘের গুরুত্ব কম নয়, তাই বৃষ্টি-দেব বরুন সবিশেষ শ্রদ্ধেয়, মেঘবাহন ইন্দ্র দেব-রাজ।

....অনার্য বিশ্বাসেও তাই। বন্যা-প্লাবনে দিক-দিগন্ত ভাসছে। আকাশে বিদ্যুতের ঝিলিক, কড়্‌কড়্‌ শব্দে বাজ পড়ে, কুলীশ পাতে দিগ্বিদিকে ছয়ালাপ, আকাশ-কটাহ কটা বর্ণ। বড় ডর লাগে। ধারা স্রোত বিরামহীন। পৃথিবী ঢেকে নিচ্ছে সমুদ্র। নদী ফুঁসছে নাগিনী। উপড়ে পড়ে গাছ—অরণ্য। পর্বতচূড়া ধ্বসে পড়ে। জলের স্রোত ভুরোর মত চেটে নেয় মাটি,—বসত,—ঘর-দুয়ার। চারদিকে ক্ষয়-ক্ষতি ও মৃত্যু-মিছিল। এ যেন ভয়ঙ্কর শেষের সে দিন। 'মারাংবুরু' অসন্তুষ্ট। ক্ষেপেছেন 'ছাপ'। ক্রুদ্ধ 'বোঙা'।

দেবতা ক্ষেপেছেন। বর্ষণের পেছনে যে শক্তি, তিনি রুষ্ট। অনাচার-পাপের ফলশ্রুতিতে বিধাতার চরম দণ্ড বিধান। বাবার সঙ্গে ভ্রষ্টাচার! তাই এত ঢেউ। শোন এই বেলা, করহ মানত রক্ষা, করিও না খেলা ক্রুদ্ধ দেবতার সনে।

ক্রুদ্ধ দেবতার রোষে ধ্বংস ও মৃত্যু জাগে। কত হিসাব নেব, কিভাবে হিসাব মেলাব, কে দেবে এ হিসাবের তত্ত্ব-হদিশ। সভ্যতায় ক্ষয়-ক্ষতি, মৃত্যু ঘটেছে সবচেয়ে কিসে বেশী? খরায়? ভূমিকম্পে বা ঝড়-প্লাবনে? যুদ্ধে?

তলিয়ে দেখলে মনে হয়, সর্বনাশ সবচেয়ে বেশি আদিকাল থেকে সভ্যতার বর্তমান দিন ইস্তক যা কিছু, তা তলিয়েছে ঐ জল-জনিত কারণেই।

দেব দেবীর উৎপত্তির ইতিহাস বলে, মানুষের যাকে যত বেশি ভয়, ক্ষতি সাধনের দোর্দণ্ড প্রতাপ যার যত বেশি, তাকে নিয়ে মানুষের অতি লৌকিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জগৎ-ও তত পল্লবিত; তার খাতির-যত্নের, সম্মান-সম্ভ্রমের আসনের ওজন-ও তত দশাশই।

কিন্তু রিণির মৃত্যুর পর আমি তো আবিষ্কার করেছি জল খুনী, রিণির যে ঘাতক তার নাম বন্যা। অপ্রমত্ত জলস্রোত রাক্ষুসী। দীপার বুকফাটা ক্রন্দন, সকলের হা-হুতাশ, পিতার চোখের নদী, বা বুক পাথর হওয়া—সবকিছুর মূলে কালান্তক যে, সে ঐ সর্বনাশী।

আমার মধ্যে তোলপাড় হয়ে উঠেছে প্রশ্ন, আমিও বলব ওকে বিধাতার চণ্ডরোষ? প্রকৃতির খেয়াল? ভাগ্যের অভিশাপ?

শোক ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসে। একদিন মনে হয়, শুধু আমিই কি হারিয়েছি রিণিকে? আমার রিণির মতো আরো কত রিণি এভাবেই তো মা-বাবা-আত্মজনের কোল খালি করে গেছে।

চোখের জলের এ ও তো এক মহাবন্যা। কত কাল ধরে সে বইছে। সে বইবে। এক শাশ্বত জল শেকলে আমরা সবাই বন্দী।

× × × ×

একদিন অন্যমনে পড়ছিলাম একটা বই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিষয়ে। ফ্যাসিষ্ট দানবের ভয়ঙ্কর মারণলীলার বিবরণ। মৃত্যু আর ধ্বংসের করাল বন্যা। সোভিয়েতে মরেছে দু' কোটি মানুষ। সেখানে এমন গ্রাম-শহর হাজারে হাজারে যে পরিবারের কেউ না কেউ যুদ্ধে নিহত। লাঞ্চ বা ডিনার টেবিলে ওরা যখন সপরিবারে খেতে বসেন, একটা চেয়ার ওরা খালি রেখে দেন। যুদ্ধে নিহত পরিবারের কেউ না কেউ যে ওটাতে বসতেন।....

পৃথিবী জুড়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিহত সামরিক ও বেসামরিক মানুষ পাঁচ কোটি কুড়ি লক্ষ ; —সোভিয়েতে দু' কোটি, পোলাণ্ডে ষাট লক্ষ, চীনে এক কোটি, যুগোশ্লাভিয়ায় সতের লক্ষ, ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম)-এ দশ লক্ষ, ফরাসী দেশে ছ'লক্ষ, বৃটেনে চার লক্ষ, আমেরিকায় সাড়ে তিন লক্ষ, জার্মানীতে ষাট লক্ষ। যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশীদার না হয়েও বৃটিশ সৈন্যবাহিনীর রণ ও খাদ্যসম্ভার যোগানোর বলি তেতাল্লিশের মন্বন্তরে ভারতে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ মানুষ।

যে হিটলারের মদমত্ততায় পৃথিবী প্রায় এক মহাশ্মশান, চমৎকৃত হই জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী ওটো গ্রোটিহোলের একটা ভাষণ পড়ে। জার্মানীর কুখ্যাত হত্যা-নায়ক হিটলার একদিন তাঁর সাম্রাজ্যের নানা প্রান্তে বানিয়েছিলেন এগারশটি গণহত্যা শিবির। জার্মানীতে স্থাপিত তার অধিকাংশের একটি ছিল ওয়েমার শহরের কাছে বুকেনওয়াল্ডে। এখানে খুন হওয়া মানুষের স্মৃতিতে পরবর্তীকালে দেশের সুসন্তান ব্যথিত আরেক রাষ্ট্রপ্রধান ১৯৫৮র ১৪ সেপ্টেম্বর এক অমর স্মারকের ফলক উন্মোচন করার সময় বলছেন—এ স্মৃতি আমাদের চিরকাল মনে করিয়ে দেবে, পৃথিবী যেন আর কখনো না হয় তাল তাল রক্ত,—যন্ত্রনার বিভৎস পিণ্ড। কখনো যেন আর পৃথিবীর মানুষকে এভাবে জীবন-মৃত্যুর সীমানায় এসে দাঁড়াতে না হয়।....

লেলিহান মৃত্যু, তাই মৃত্যুকে উপড়ে ফেলার সাধনা। এ সাধনা আজ গ্রহ জুড়ে প্রায় সবখানে।

সহস্র-কোটি প্রাণঘাতী, অযুত ধ্বংসের মূল, বন্যাও মানুষের এক ঘোর শত্রু। রিণি আমাকে চোখ খুলিয়ে গেল—বাপি, এই হত্যাকারীটাকে চেনো—শয়তানের মতো ও চারদিকে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে........

চোখ বুজি। রিণি বুকে বলে যাচ্ছে, পৃথিবী যেন আর কখনো এমন মৃত্যু ও হাহাকারজোড়া না হয়। হাসি-ফুলগুলো যেন ঝরে না পড়ে....।

মৃত্যুর এক স্মৃতির সামনে রিণি দাঁড় করায় আমাকে। রিণি এক দুঃখময় অবিস্মরণীয় স্মৃতি। রিণি কিন্তু এক দারুন প্রতিজ্ঞা। রুখে দাঁড়ানোর এক উদাত্ত আহ্বান। আমি টানটান হয়ে উঠে দাঁড়ানো এক পিতা,—এক মানুষ,—এক বিশ্ব-নাগরিক। ধনুর্দ্ধর

হাতে তুলে নিয়েছি গাণ্ডীব। আকর্ণ জ্যা টানতে টানতে উচ্চারণ করছি—বন্যা, তুই অভিশাপ নোস, চিনেছি তোকে। উন্মোচিত হতে চলেছে রহস্য....।

'Strait is the gate and narrow is the way which leadeth unto truth ; and few there be that find it.'

From 'New Testament'

(বারো)

বিধ্বস্ত মাটিতে সুস্থ কোন কিছু জন্মাবে, এরকম আশা সচরাচর দুরাশা মাত্র।

খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচশ পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর আগের ঘটনা। পারস্যের রাজা সাইরাস বেলসাজারকে হারিয়ে ব্যবিলন দখল করেন। ব্যবিলন জায়গাটা দেখে সাইরাসের মন্ত্রী-অমাত্যরা খুব খুশী। রাজা মশাইকে পরামর্শ দিলেন, পারস্যের রাজধানী ব্যবিলনে আনলে কেমন হয়? সাইরাস প্রস্তাব শুনে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ করলেন—'নরম মাটিতে যে নরম মানুষ জন্মায় হে।'

এখন অবশ্য অন্যকথা আগে, ভিক্ষার চাল আবার কাড়া আর আকাড়া! বাছ-বিচার দূর অস্ত। যেখানে জুটেছে পা রাখার ঠাঁই, সেটায় পা রাখা যায় তো, অন্যকথা ভাবা সে তো ভদ্রয়ানা, ভব্যয়ানা, বিলাস মাত্র।

বড়োসড়ো করে বেশ কথাখানা আছে, খারাপ হয়ে কেউ জন্মায় না? কেউ কি জন্মায়?

বাস্তব-নিকেশ তো খুব একটা মেলে না।

হরিনাথ, ধোপার কাজ করে। বাড়ি-বাড়ি ঘুরে ময়লা জামা-কাপড় নিয়ে যায়। ক্লেদ ধুয়ে মুছে আবার ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়। জিজ্ঞেস করি—ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাও না কেন ?

খুব তিরিক্ষি ভাবেই উত্তর দেয়,—সিরিয়াস ভাবেই বলে—কিচ্ছু হইব না, ও লেখা-পড়া শিইখ্যা কিচ্ছু হইব না। ভেরেণ্ডা গাছে হাজার চেষ্টা করলেও কি কখনো পদ্মফুল ফোঁটে ?

সত্যি বুঝি তাই, পদ্ম দূরের কথা, শালুকই বা কেন ফুঁটবে ! ননী রাত দিন কি হাড়ভাঙা খাটুনি খাটে, রাতে দেশি মদ খেয়ে পাড়ায় ঢোকে। জপন কষ্টে স্বষ্টে রিক্সা চালায়, পয়সা উড়িয়ে দেয় সাট্টা খেলে। প্লাইউড কারখানায় কাজ করতে যায় অনেকে, যায় এখানে-ওখানে আরো কতখানে। কিন্তু সব জায়গায় মৃগয়ার ছাওয়া আছে জাল। ফাঁদে সকলকে পড়তেই হবে যে।

গরীব-গুর্বো ছাড়া যারা আছে কাঞ্চন-কৌলিন্যে, তারা কাকের মতো বোকা-চতুর। আবর্জনার মধ্যে মুখ লুকিয়ে রেখে ভাবে, কই কে আমায় দেখতে পেয়েছে !

আসলে ভয়ংকর এক কালমৃগয়ার লক্ষ্য বিন্দুতে এখন জীবন। উন্মত্ত শিকারীর দল চারদিক থেকে বেড় ছোট করে এনেছে—ছোট গণ্ডী, আরো ছোট। বন কাঁপিয়ে তারপর উল্লাস, বিভংস অট্টহাসি, বর্শামুখে বিদ্ধ জীবন, কাতরাচ্ছে, গল গল টাটকা রক্ত পড়ছে অথবা বিদ্ধ তীর থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্তের ফোঁটা যেন বৃষ্টি পড়ে টপটপ.।

লক্কা বলে একটি ছেলে এলাকায় একটু কাপ্তেন গোছের। এর মধ্যেই নাকি অন্ধকার জগতের সঙ্গে ওর দিব্যি সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে গেছে। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম—ভালোভাবে থাকতে ইচ্ছে করে না ?

....এসব আমার বাগুইআটির জীবন-দর্পনতা নিয়ে জীবন কি, এ প্রশ্নের উত্তরে পৌছোনো। বাগুইআটি নাম এখানে এহ বাহ্য। এক ছবিতে মিলে যাবে হাজার ক্যানভাস।

লঙ্কা অসহিষ্ণু ভাবেই বলেছিল। হ্যাঁ, সাজিয়ে গুছিয়ে নিলে জমাট গল্প বা মহাকাব্য হয়ে যায়। —আমাদের পাড়ায় আলো ঢোকে না। ঘরে আসতে লজ্জা হয় সূর্যের।

—থাকবেন স্যার, একদিন, অন্তত একবেলা বস্তীতে?

—দারিদ্র্য সম্বন্ধে আপনার কি আইডিয়া আছে? কুকুর-বেড়াল-ও ওর থেকে ভালো থাকে।

—আসুন না, দেখে যাবেন নরক একেই বলে কি না?

—বুঝলেন স্যার, এখানে আমরা মায়ের পেট থেকে পড়ে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে বাঁচি, ওসব খেয়েই বড় হতে থাকি, যেমন ঐ রাস্তার কুকুরের সন্তানের জন্ম, বাচ্চাগুলো টিকে গিয়ে বড় হয়ে ওঠে। বড় হতে হতেই আমরা যা দেখি তাই হব না তো কি সাধু-সন্ন্যাসী হব! চারদিকে নোংরা আর নোংরা, ময়লা-আবর্জনা। মারামারি খুনোখুনি, গালি-গালাজ, ঝগড়া-ঝাঁটি, অকর্ম আর কুকর্ম, অমানুষ জীবন,—আপনারা এসব দেখবেন কি করে? স্বার্থ ছাড়া আপনাদের কি এখানে কোনদিন পায়ের ধুলো পড়ে?

—ভালো না থাকার পেছনে এগুলো কি যুক্তি হলো? আমি জোরালো গলায় প্রশ্ন তুলি। লঙ্কা কি বলতে পারে উত্তর আঁচ করে প্রশ্নের বোঝা আরো ভারী করে দিই—যে অবস্থায় আছ, তার থেকে বেরিয়ে আসার উপায় কি খুঁজতে ইচ্ছে করে না?

লঙ্কা স্তম্ভিত করে উত্তর দেয়—উপায় এখন খুঁজলেও পাওয়া যাবে না। আগে আগুন সবার গায়ে লাগুক, টনক একদিন আপনা থেকেই সবখানে জাগবে।....

বিপ্রদাস আমার পরম স্নেহভাজন ছাত্র। পাড়ার একটা সর্বার্থ-সাধক ক্লাব প্রভাতী সংঘের করিৎকর্মা সম্পাদক। প্রভাতী নামটা ছিল রিণির ভালো নাম। ওর নামেই ক্লাবটার একদিন প্রতিষ্ঠা।

বিপ্রদাসের সঙ্গে লক্কার বক্তব্য নিয়ে একদিন আলোচনা করি। বিপ্রকে এভাবেই জিজ্ঞেস করি—আচ্ছা বিপ্র, এই যে ধরো আমাদের ক্লাবে ছেলেমেয়েদের জন্য খেলাধূলা শেখানোর ব্যবস্থা, আছে সংস্কৃতিমনা করার নানা আয়োজন, টোটাল সমাজ-জীবনে তার কতটুকু ইমপ্যাক্ট আছে?

বিপ্রদাস নিম্নবিত্ত ঘরের ছেলে। আলোকিত মননের অধিকারী। রোদ থৈ থৈ ওর হৃদয়ের উঠোন। আলোয় আলোময়।

চারদিকে ঘোর অন্ধকার। অন্ধকারের বানভাসি। দামাল অন্ধকারে বিপ্ররা এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। জ্বলে এক অনন্য সার্চ লাইট।

আরো আলো আছে। জ্বলে—ওরা-ও জ্বলে। ঐ ননী, জগন, যাদের কথা আগে বলেছি ওরাও সবাই একরকম নয়, ওখানেও অন্য ছবি আছে।

...থাকবেই। কিন্তু চারদিকে গরল নিশ্বাস খুব যে ফোঁস ফোঁসে রোষে। সমগ্রতার মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তাই জল্পনা কল্পনা,—অটুট কি সবখানে জীবনের বিচ্ছুরণ? নীল গগণ তলে ওড়ে কি পতপত রোদের কিংশুক পতাকা? হে তমিস্রাভেদী আলো, কি তোমার অমোঘতা!

প্রশ্ন শুনে উত্তরকে প্রথম ধাপেই বিপ্র উঁচু স্কেলে বাঁধে।—প্রভাব অবশ্যই আছে বৈ কী। প্রথম কথা, লক্কা যা বলেছে সে সূত্রেই বলি, আমরা যা করছি তার এ্যাকশন বলতে পারেন ডাবল সাইডেড। আমরা একদিকে বাঁধ বেঁধেছি, নোনা জল যেন ফসলের ক্ষেতে ঢুকতে না পারে। দ্বিতীয়ত, লক্কা যা বলেছে ওটা ঠিক নয়, একদিন

পজিটিভ কিছু দিয়েই নিগেটিভটাকে জয় করতে হবে। এ' ছাড়া এ বিষয়ে বলুন তো আপনাকে বেশি আর কি বলব? আপনি তো জানেন সমাজ-কাঠামো না বদলালে কিছুই হবার নয়, ততদিন কি আমরা হাত গুটিয়ে....। ভাইটাল কোন কিছুর পাশাপাশি অন্য অনেক-কিছুরও তো ভূমিকা আছে।

দীপা বিপ্রর জন্য চা-জলখাবার বানিয়ে নিয়ে আসে। টেবিলের একধারে বসতে বসতে জিজ্ঞাসা করে, কি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে শুনি? বিপ্র চা ও পাঁপড়ে মুখ দিতে দিতে একটু গৌরচন্দ্রিকা সেরে নেয়। দীপা সব শুনে-টুনে আমায় অবাক হওয়া দৃষ্টিতে প্রশ্ন ছোড়ে—কি বলছো তুমি, ক্লাবে যা হচ্ছে, এগুলো ভালো কি-না তা তোমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে না কি?

আমি তাড়াতাড়িই বলি—না, না, আমি কি বলছি আগে ব্যাপারটা বোঝ। আমি একটা বিচ্ছিন্নতা ও দেওয়াল নিয়ে চিন্তিত।

আমি লঙ্কার কথার জের টেনেই দীপা ও বিপ্রর সামনে প্রশ্ন রাখি—আমাদের এখানে ক্লাবে যারা আসছে তাদের সকাল থেকে পরের দিন ভোর, এভাবে মাস, বছর এবং বছরের পর বছর এমন এক পৃথিবীতে বাস করতে হয় কি, যেখানে সভ্যতা এখনো অসূর্যম্পশ্যা! যেখানে মানুষ-জন্মের ভাবনা এখনো কষ্ট কল্পনার বিষয় মাত্র!....আলো জ্বলছে এখানে। এখানে আলোয় আলোময় নিখিল বিশ্ব। অন্যত্র অন্ধকার,—আর অন্ধকার; মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে এক সলিটারি সেল—নির্জন দ্বীপ। আমার প্রশ্ন, কিভাবে একাকার হবে দুই পৃথিবী?

দীপা সাবলীলভাবেই উত্তর দেয়—আলো দিয়েই তো অন্ধকার তাড়াতে হয়। আলো ছড়িয়ে দিয়ে....।

আমি কথার মাঝখানে বাধা দেই। জিজ্ঞাসা করি—আলো

বলতে তুমি কি বলতে চাইছ? শিক্ষা, চেতনা, অন্যকিছু? দীপা ক্ষিপ্রভাবে সম্মতিসূচক উত্তর দেয়। বিপ্রদাস-ও গলা মেলায়—আলো মানে স্বচ্ছদৃষ্টি, ...মুক্তি-বোধ....।

আমি জানি আলোচনা কোন, দিকে এগিয়ে যায়। বিপ্রদাস জীবন-সচেতন প্রগতিবাদী মননের ছেলে। এক কথাতেই চট জলদি আলোচ্যমান প্রশ্নে সে উত্তরের যবনিকা টেনে নামাতে পারত। নামালো না সে। তার সামনে যুদ্ধক্ষেত্র উন্মুক্ত, তা খুব ভয়ঙ্কর। অনেকটা যেন মাটির নীচে খনি আর আরেকদিকে খোলা খাদান। বিপ্র সে খোলা খাদানের এক খনিত্র। নীরবে কাজ করে যায় চলে। কি কাজ? বুঝি চোখে তা দেখা যায় বড় কম। জানতে হয় অনুভবে —গভীর মননে।

নীরবে পৃথিবীতে এক উৎসবের মেরাপ বাঁধা হচ্ছে। প্রদীপের সলতে পাকানো ধীরে ধীরে।

হাওয়া চোখে দেখা যায় কি? আবহাওয়া গুটিগুটি বদলাচ্ছে। বিপ্র ঝড় নয়, টর্ণেডো নয়, শাশ্বত-ও নয়—শাশ্বত সেনদের মতো নয় উচ্চকিত। বিপ্র বিপ্রই। মহা-হোমানলের পূতাগ্নি শিখা রচনা তার নিভৃতে, নীরবে। তার কর্মসাধনায় দ্বিজত্বের প্রশান্তি।

পাড়ায় অনেক প্রতিকূলতাকে জয় করে ও ঐ প্রভাতী সংঘকে গড়ে তুলছে এক অন্যভুবন। কতদিন সে আমাকে এসে বলেছে, একটা সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে এ-পাড়ায় মানুষে মানুষে কত দেয়াল। উচ্চ-বিত্ত পড়শী যারা তাদের এ ক্লাব ব্যাপারে সুবিশ ভাবনা-চিন্তা; মধ্য-বিত্তদেরও মধ্যে নানা রেষারেষি, ক্লাবের নানা অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন নানা ক্রিয়াকর্ম ঘিরে, বাড়ির শিশুদের তাতে যোগ দেওয়া ও ভূমিকা পালনের ব্যাপারে নিম্নবিত্তদের চিন্তায় কত আশ্চর্যময়তা, সমস্ত কিছুকে নিয়ে এককথায় কত অস্বাভাবিকতা, কত সমস্যা, এসব

নিয়ে বিপ্র কতদিন এক বিচিত্র জগতের নীরব সাক্ষী। বিপ্র তো কতদিন এসে আমাকে এও বলেছে, ক্লাবকে কেন্দ্র করে যে নির্মল সংঘবদ্ধতা, তা এখনো শেকড় ছড়ায় নি সর্বত্র।

লক্কারা ক্লাবে আসে নি। অনেকেই আসে নি। গলির মোড়ে ক্রমশ পল্লবিত হয়ে চলেছে অভব্য আড্ডা। বরং ব্ল্যাকমানির মতো ওরাই যেন প্রতিপত্তিময়। বাগানে একটা যেন ফুটেছে সুগন্ধী গোলাপ। শত লুব্ধক হাত ঘিরে আছে ওকে বেড়ে।

বিপ্রদাসই একদিন আমাকে সিদ্ধান্ত শুনিয়েছে—মনে হয় ইটস্ রাদার এ হার্ড টাস্ক। হয়তো হেরে যেতে হবে। আমরা কেউ মানুষ থাকছি না। প্রত্যেকেই দ্বীপ হয়ে যাচ্ছি—অসংখ্য দ্বীপ। নিজেদের চারপাশে প্রাচীর ঘিরে ফেলছি।....

—একজ্যাকটলি তাই, আমি এ কথাই বোঝাতে চেয়েছি। দিনকাল যত সমস্যার মুখোমুখী হচ্ছে, মানুষের হাত খর্ব হয়ে যাচ্ছে, বুক বর্ম পরে নিচ্ছে, শামুকের খোলসে ঢুকে পরার বর্ম। পৃথিবীটায় চটপট দেয়াল উঠে যাচ্ছে। অস্তিত্বের চারপাশে পরিখা-প্রাকার। মানুষ আমরা হাজার হাজার দ্বীপবাসী। রক্তবীজের মতো বাড়ছে বিচ্ছিন্নতা।

এক যাদুকর অদৃশ্যে থেকে ভেজেছিলেন এরকম এক ভয়ংকর খেলা। হরেক কিসিমতের খেলা আছে যাদুকরের ঝোলাতে। তবে অন্য খেলার কথা আপাতত তোলাই থাক। সে সব নিসন্দেহে গূঢ় খেলা। সাধারণ খেলাটার কথাই হোক। সব জলের সমবেত রূপ তো ঐক্যবদ্ধ এক মহান সমুদ্র। আমাদের বিরাট এক বিপর্যয় ঘিরে যদি ওঠে সম্মিলিত ক্রন্দন, তবে তা তো জমাট সাগর। না, বিরাট সমুদ্রের তীরে দাঁড়ানো আমরা আরেক সমুদ্র, উত্তাল আরেক জলধি, সে ছবি বুঝি দৃশ্য তালিকায় নেই। আপাতত প্রায় অদৃশ্য।

—লেডিস, এ্যাণ্ড জেন্টেলম্যান, মাই ওয়ান সুপারহিট—এ ভেরি কমন আইটেম—ওয়াটার অব ইণ্ডিয়া ।....

—বার বার সুদৃশ্য জলাধার কাত হচ্ছে—বিন্দু বিন্দু জল আর জল। বুক বওয়া অনুক্ষণ প্রবহমান হাহাকার। চুইয়ে চুইয়ে পড়ে। অথচ তা সমুদ্র হয় না, নদী হয় না, প্রমত্ত ঢেউও নয়। শিকলি বাঁধা জলে আমাদের ঘর দুয়ারে কি ভাসে এক উঠোন থৈ থৈ একতা! অথচ সহজ হিসেবে এখানেই তো গড়ে ওঠা স্বাভাবিক ছিল এক অনন্যময় রাখীর।

মাদারী কা খেল, এখন খুব জম-জমাট। হাততালি লাগাও জোরসে বাচ্চালোগ।

বিধ্বস্ত দেশে—ওয়েষ্টল্যাণ্ডে কোন স্বাভাবিকতার স্থান নেই।

চৌচির মাটিতে বুঝি, খণ্ডিত মানুষই জন্মায়।

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এক কবিতায় পড়েছিলাম লাইন গুলো।

শূন্যতার আর কোনো বিশিষ্ট সংকেত জানা নেই
আমাদের, কাছে থাকে ইট কাঠ প্রাসাদ জানালা
আর কিছু কাছে নেই যাকে বলে সপ্রাণ, সজীব
অথচ সকলে আছে আত্মভুক্ পারদের মতো
সংক্ষেপ, গুটিয়ে নেয়া, যেন জাল নদীর কিনারে
যেন পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন, একক, নিজ দ্বীপ
নিজেরই আকাশ নিয়ে হতভম্ব সমুদ্রের কাছে—
শুই আছে—আর সবই নাস্তি নাস্তি—কিছু না কিছু না।

এভাবে বেঁচেও আছে সরীসৃপ এবং মানুষ
এই দেশে, এই কালে—ভ্রাম্যমান সংবাদ-শিখরে

বড় মনে আসে—মনে আসে। কেন যেন বড় মনে আসে।

(তেরো)

রিণি এনে আমাকে দাঁড় করিয়েছে জীবনের দেহলীতে। জগৎ, জীবন, পরিপার্শ্ব, এদের আধারে মুকুরিত নানা জিজ্ঞাসা এখন আমার মধ্যে সদা মুখর।

জীবন এক বিরাট বই ছাড়া কিছু নয়। হয়তো মহাকাব্য কিংবা কি জানি ঢাউস এক এনসাইক্লোপেডিয়া। পৃষ্ঠা উল্টাই, পৃষ্ঠা উল্টাই। মনে ঘোর লাগায় পাতায় পাতায় নীরব অক্ষর, আশ্চর্য বর্ণমালা।

বাগুইআটির উপকথাই আগে আরেকটু বলে নিই। অবশ্য তার আগে আবার বলে নেওয়ার আছে আবশ্যিকতা, বাগুইআটি নাম এখানে উপলক্ষমাত্র, যেমন এ' কথকতার চরিত্রলিপিতেও সে কথা বহুলাংশে খাটে—জামা বা আলখাল্লা একরকম, যে খুশী যেখানে-সেখানে নিয়ে যখন-তখন পরালেই হল, ফুট-ঝুলে একটু আধটু বেমানান হলেও হতেও পারে। কিন্তু তা জামা—জামা-ই। ঠিক ঠিক এঁটে যাবে।

····নিরঞ্জন সেন একজন নাট্যকার। স্যাম্পেলসার্ভের বাংলা করেছেন গবাদিপশু-সুমারী ;—মানে, ব্যাপারটা তা হয় কিনা বলুন, একটা গ্রামে ঘুরুন, খোঁজ নিন কার ঘরে কটা গরু-ভেড়া-ছাগল আছে, কটা মুরগী বা হাঁস-হাঁসিনী। এবার ব্লকে কটা ঘর বা ইউনিট, মুখে মুখে টকটক গুণ করে ফেলুন, ইকোয়েলটু অমুক ব্লকে এত এত গবাদি-পশু।····

নিরঞ্জন দুরূহকোণ থেকে বুঝি আচমকা গোলে শট নিতে খুব ওস্তাদ। রসিকতা করতে করতেই অতর্কিতে প্রশ্ন ছোড়ে—বলুন, আপনার পাড়ায় একটা খেলার মাঠ আছে? আচ্ছা, আছে। ফরচুনেট, অনেক জায়গায় সেটা নেই। খেলার মাঠ মানে খোলা

জমি, এক-দুই বিঘা। ভ্যালুয়েশন কত জানেন? প্রায় ছ থেকে সাত-আট লক্ষ টাকা।

—পার্ক? বলেন কি,—আরে আপনারা তো নিয়ারার টু হেভেন মশাই।.... হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝেছি, বুঝেছি, খেলার মাঠে খেলাধুলো যদিও একটু আধটু হয়, পার্কে!—হ্যাঁ জানি, জানি, আর বিস্তারিত বলা নিস্প্রয়োজন আমি ও গুলোর নাম দিয়েছি বিষস্ফোটক।

নিরঞ্জন আমার শ্যালক। শ্যামলের ঘনিষ্ট বন্ধু। নানাসূত্রে সম্পর্ক আমাদের মধ্যে খুব নিকটতর হয়েছে।

নিরঞ্জন আকর্ষনীয় ভাবে বলে যায়। দেখুন, আমি বলে যাচ্ছি মনে মনে মিলিয়ে নিন। (কি যে রগুড়ে ছেলে!)

জনান্তিকে সে হাঁক দেয়, হে—ই স্ক্রিনার ম্যান, রেডি—ড্রপ স্লো ওপেন। লাইট,—ডিম্, সফট্ ইয়েলো। মিউজিসিয়ানস, ওয়ান, টু, থ্রি,—স্টার্ট, জ্যাজ বিট—রোলিং সিমফনি, বাঁদিকে জোনাল লাইট মেরুন হবে।....

আশ্চর্য-ভাবে নিরঞ্জন যেন ঘরের মধ্যে এক নাটকের মহড়া শুরু করিয়ে দেয়। অভিনয়ের পরিচালনা। এক ফাঁকে বলে নেয়—ভেবে নিন একটা নাটক, হ্যাঁ—হ্যাঁ, মিলিয়ে নিতে থাকুন,—দেখুন রাস্তা সব হেঁটে হেঁটে গিয়ে কোথায় মেলে....।

মনে করুন, এরকম একটা দৃশ্য, স্টেজে ঘোঁতন পিন্টু, আনোয়ার শুকদেবের সঙ্গে মাইমে সলা পরামর্শ করছে। প্রথম তিনজন বস্তীর ছেলে। শুকদেব এখানে আগন্তুক। পোষাক টিপটপ, মুখে ফ্রেঞ্চ কাট দাঁড়ি, চোখে কালো চশমা। ওর হাতের এ্যাটাচি কেস থেকে একসময় টাকা বিলি হয়ে যায়। টাকাটা ঘোঁতনই নেয়। সলা-পরামর্শ আরো চলে। একসময় শুকদেব চলে যায়। নেপথ্যে মিলিয়ে যাওয়া মোটর বাইকের শব্দ।

—জোনাল লাইট লেফট, কাট। মিউজিক লাউডার। রাইট সাইডে জোনাল লাইট জ্বলে উঠবে নীল।....

রেবা উপেন দাসের মেয়ে। উপেন দাস একটা স মিলে কাজ করত। একটা হাত কাটা, অক্ষম। উপর্যুপরি ক্ষয় রোগী। কাশতে কাশতে গলায় আটকানো গয়েরটা গাণ্ডীব টানে ঝেড়ে ফেলতে প্রাণান্ত চেষ্টা করে। রেবা একটা হাত-আয়না সামনে নিয়ে লাল ফিতে বাঁধা চুলের বিনুনি দেখে নেয়। ঠোঁটে সস্তায় কেনা লিপ্‌স্টিক ঘষে মুখের মেকআপও লক্ষ্য করে। আয়নাটা ঘরে একটা কাঠের থামে আঁটকানো পেরেকে ঝুলিয়ে রাখে। আরেকটা অনুরূপ খুঁটিতে টাঙানো পেরেক থেকে একটা ভ্যানিটি ব্যাগ নামিয়ে আনে। মুখটা খোলে। একটা রঙীন চশমা বের করে দড়িতে ঝোলানো শাড়িতে আস্তে আস্তে মোছে। সে সময় বাইরে ঘোঁতন একটা শিষ দেয়। সিগারেটের ধোঁয়া লম্বা করে ছোঁড়ে। রেবা একটা তক্তপোষের কাছে এগিয়ে নীচ থেকে জুতো বের করে পায়ে গলায়। শাড়িতে ফের হাত মোছে। চশমাটা খুলে চোখে পরতে যায়।

উপেন দাসের চোখ এতক্ষণ বোকাহাবা ভিক্ষুকের মতো রেবার সঙ্গী হয়ে ছিল। উবু হয়ে বসা তার বুক উঠছিল-নাবছিল। তক্ত-পোষের ওপর দিয়েই সে হঠাৎ গড়াতে গড়াতে আকুলভাবে রেবার দিকে এগোতে থাকে। তাকে উদ্দেশ্য করে কথা বলতে শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে শুকনো কাশির ঢলক। হাঁফাতে হাঁফাতে তবু বলে,—আজকে ওষুধটা আনবি তো....? রেবা ফ্রণ্ট সেন্টার দিয়ে লেফটে চলে যায়।....

আমি কপটরাগে নিরঞ্জনকে বলি,—এই এ'সব হচ্ছে কি? নাটক লিখতে লিখতে মাথাটা যে একদম গেছে!

নিরঞ্জন উদাসীনভাবেই উত্তর দেয় কেন,—মেলাতে অসুবিধে হচ্ছে ?

আপন খেয়ালেই বুঝি সে তারপর বকে চলে। আমি প্রয়োজন মতো হুঁ, হ্যাঁ করি। বিরক্ত বোধ করি না। বেশ আকর্ষণ পাই।

—আপনাদের পাড়ায় নিশ্চয়ই একজন শ্যামলালবাবু আছেন অথবা সুনীতি সরখেল.... ? থাকতেই হবে। সব জায়গাতেই ওরা সদলে বর্তমান। একজন প্রবীন সমাজসেবী, আরেকজন নবীন সূর্য। আগে ঐ প্লেসটা ছিল ছেনোরই বাঁধা। ছেনো কেন জানি এখন ধূসর জ্যোৎস্না হয়েছে, কিংবা অমাবস্যা।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ মুকুন্দ, অনিমেষরা তো থাকবেই। থাকবেনই সুনীল মাষ্টার। কেষ্ট সাধু পদ্মায় সাঁতার কাটত। ধীরা গোবিন্দ খাদ্য আন্দোলনে এক পুলিশের তলপেটে সজোরে লাথি ঝেড়েছিল। হ্যাঁ, দেখলে, তা এখন আর চেনা যাবে কি করে ? সে অনেক কথা, সে সব এখন থাক....।

—শাশ্বতকে চিনি না ! খুব চিনি। চিনি—চিনি সবাইকে চিনি, সব কিছু চেনা-জানা। কিভাবে প্রতিদিন সুইচ অন করলে সূর্য, সুইচ অফ্ করলে লাফিয়ে আসে অন্ধকার,....হাত সাফাই এর তাসের মতো ঘুরে যায় গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত, শীত, বসন্ত। টি ভি যেন উগরে দেয় স্থির চিত্র। খবরের কাগজ ফিল্ম তোলে, সাদা-কালো ছবি অথবা মালটিকালারড্।

—কাল বৈশাখী বয়ে যায়। বর্ষা মড বা ডেসপারেট। শীত বরং সহনীয়।

—মাঠ আছে। ঘাস গজায়। বসন্তে দখিনা বাতাস বয়। শীতে মিড অনের মাথার ওপর দিয়ে পাড়ার কপিলদেবরা সপাটে বাউণ্ডারি হাঁকড়ায়, কিন্তু এ কী, দৈত্যের গতিতে ছুটে আসছে এ

কোন্ মূর্তি ! —ছুঁড়ে মারছে হাজার বাউন্সার, অগুন্তি সাপের ফণা বিমার.... !

সিচুয়েশন কাট্,—কাট্। প্যাক আপ। এগেন লাইট। মঞ্চ আলো-আঁধারি। নেপথ্যে বলির বাজনা আস্তে থেকে জোরালো হতে থাকবে ?

পিস্তল হাতে লক্কা চেঁচাচ্ছে—আয় শুয়োরের বাচ্চা, মরদ হলে শালা এগো।.... হীরু বাড়াবাড়ি একটু বেশি হয়ে যাচ্ছে না কি ? তুই আবার ছোটকার মাল নিয়ে খিঁচান শুরু করেছিস.... ?

ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। দৃশ্যপট মুহুর্মুহু বদলে যাচ্ছে।

—এই শালা নুরু। বড়বাবু এই বেলা থানায় দেখা করতে বলেছেন। দুটো ডাবল স্প্রিং ছাতা নিয়ে যাস্। বড়বাবুর দুই শালী এসেছে....

—মাধ্যমিকে এবার ফার্স্ট হলো কে, ছেলে না মেয়ে ? কোন্ স্কুল ? আর বলবেন না মশাই, ওটা আবার একটা স্কুল না কি ? স্কুল তুলে বরং হাসপাতাল করে দেয় না কেন গভর্ণমেন্ট....

—হুজুগ, স্রেফ একটা হাওয়া আসা ? ভজন ঐ দু' চারদিন চলবে। টের-ও পাবে না কবে ফ্লপ করবে। শালা, গেয়েছে, মাইরি....

—সেদিন ফিরতে দেরী হলো কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেছিল ?....

—ওখানে ব্যাকিং ছাড়া কিছু হবে না। একটা পাঞ্জা, খসাতে পারবি ? কম করেও তিন পাত্তি....

—না আমুল নেই। কি করব সাপ্লাই আসছে না। দুটো টাকা বেশি দিয়ে যান, ওবেলা দেখি....

—হ্যাঁ এবার পুজোয় অজন্তা-ইলোরায় যাচ্ছি....

—নিন না, বেকার ছেলেদের বানানো ধূপকাঠি এক প্যাকেট....

—কেন ? এটা কি তোর বাপের টিউবওয়েল ?....

—'আক্রোশ' আফটার অল এ্যানাদার নিউ-ওয়েভ....

—তন্তুজে রিবেট শুরু হয়েছে ?....

—পুজোর আগে নাকি এবার বোনাস দেওয়ার ফাইলটা ফাইনান্স ডিপার্টমেন্টে গেছে ?....

—মা, ছোট ছেলেটার একমাস থেকে জ্বর। এ' মাসে কটা টাকা বেশি দিতে হবে....

—অবিলম্বে বন্ধ কল-কারখানা খুলতে হবে....

—মা দুটো ভিক্ষে দেবেন....

—মরতি পারো না তুমি। আবার ঐ ছাঁই-পাশগুলো খেয়ে এয়েছ ?....

—বুলডজার দিয়ে এই বস্তীগুলো ভেঙে দিলে....। দেখুন, হারামজাদাগুলোকে দেখুন। পিল পিল করছে যেন মুরগীর বাচ্চা....

আচ্ছা ওদের কি কোন বার্থ কন্ট্রোল-ও নেই ?....

—এই মেন্দামারা শাসন ও পুত পুত ডেমোক্রেসি দিয়ে কিচ্ছু হবে না মশাই। চাই একবারে মিলিটারি রুল! চাবুক মেরে মেরে....

অধৈর্য হয়ে এবার নিরঞ্জনকে একটু চড়া গলায় বলি। কি তখন থেকে যা তা বকে চলেছ। তোমার এই নাটুকেপনা, বল একঠায় শুনতে ভালো লাগে কি ? কি জানি মাথাটা একেবারে গেছে না কি ?....

—জাস্ট এ মিনিট, একটা সিম্বলিক অংশ আছে। একটা হিব্রুয়িয়ান মিথ—আলোর দেবতা আহুরমাজদা। অশুভ শক্তি আহরিমান। কত অন্ধকার, কত কত রাত্ত, কত ঝড় তুফান, অবশেষে....

একটু সুর ফেরাতে চেষ্টা করি—এ তো বাঁধা গতেরই নাটক!

প্লটে প্রেম কই ? নাটক কই ? নায়ক-নায়িকা ? কি দাঁড় করাতে চাও শেষে ? ছক তো চেনা চেনাই ঠেকছে !

—হ্যাঁ চেনা তো হবেই। প্রেম ? আছে বটে। সব পাত্র-পাত্রী এখানে ইন দি ট্রু সেন্স নায়ক। নায়িকা,— বাঁচা। ওকেই সবাই পেতে চাইছে। ওকে পাওয়ার চরম আকুতি সবার মধ্যে ঘনীভূত। সবাই বাঁচতে চায়—মানুষের মতো বাঁচতে চায়—থার্স্ট ফর লাইফ। কনসেপশন, রাদার একেকজনের আলাদা। তবে দেয়ার লাইজ দি চার্ম অব দি ড্রামা, ইচওয়ান অর এভরি ক্যারেকটার কি আশ্চর্যভাবে ভালোবাসে জীবন, তারা একটা পৃথিবী খুঁজছে যা একটা কাল্পনিক দেশ নয়, একটা রক্ত-মাংসের ভুবন।....

নিরঞ্জন কি যেন বলে যায়। ওর কণ্ঠস্বর আমার কানে ক্রমশ যেন ক্ষীণ, ক্ষীণতর—ধূসর।

নিরঞ্জন বলে যায়—In a waving mirror, through trembling water/A sky, a gala Autumn's idol-face/ Does projects a noble reflection / where one can see a beautiful pilgrimage / A tragic world moves unto life, making a throughfare to eternal light.

নিরঞ্জন যেন প্রশ্ন করছে—বলুন, যা বলেছি তা জীবন দর্পণ কি না ? এর ওপর দাঁড়িয়ে বলুন একটা হিসাব মেলানো যায় কি না.... ?

আমি হিসাব মেলাই। রিণি আমার সামনে মজুত করে এনে দিয়ে গেছে শ্লেট, পেন্সিল, খড়ি, আমি আঁক-জোঁক কাটি—আর্থ সমাজব্যবস্থা না পাল্টালে কিভাবে.... ?

ওসব কথা থাক। আমি পেয়েছি আরেক ছবির জগৎ। আমার মনের নৌ-যাত্রা অসীম এক জিজ্ঞাসার দিকে।

(চোদ্দ)

খুনী ঘুরছে মানুষের পাশে পাশে। ভাড়াটে খুনী। খুনীকে কাজে লাগিয়েছে একজন। সে আছে লোকচক্ষুর অগোচরে।

রিণির মৃত্যুর আগে এবং পরে বহুদিন পর্যন্ত আমার ধারণা ছিল কালান্তক বন্যা বিধাতার অভিশাপ, প্রকৃতির নির্মম খেয়াল। জন্ম থেকেই ওর খুনে স্বভাব।

কিন্তু আচমকা একদিন মনে হল, বন্যা তো প্রকৃতির স্বাভাবিক এক ঘটনা মাত্র। স্বাভাবিক নিয়মে এখানে বৃষ্টিধারার ঝরে পড়া। কোন কোন সময় অতিবর্ষণ হতেও পারে। যেমন ঘটতে পারে তার উল্টোটাও। আবার প্রাকৃতিক নিয়মেই এই অতিরিক্ত জলরাশির বেরিয়ে যাওয়ার জন্য প্রকৃতিতেই আছে স্বাভাবিক ব্যবস্থা।

কিন্তু এই স্বাভাবিক ব্যবস্থা যদি কোন না কোন ভাবে হয় বিঘ্নিত, তবেই শেকল পরা জল হয়ে ওঠে ক্ষুব্ধ এবং বিদ্রোহী। সে বিদ্রোহ ধারণ করতে পারে চরম ও ভয়ংকরতম রূপ।

বিদ্রোহকে দমন করবার ও শাসনে আনবার জন্য দিকে দিকে মহা হুলস্থুল। সভ্যতায় এ' এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। বিদ্রোহ যেন না হয়, সে অবস্থার কারণগুলো দূর করা ইতিহাসের ধাতে বা স্বভাবে কখনই নেই। ব্যাপারটা সচরাচর বরং এরকম—কি খবর এনেছ গুপ্তচর, কি অমুকে বিদ্রোহ করেছে! এত বড় দুঃসাহস! সেনাপতি,....

—বলুন মহারাজ.

—অবিলম্বে সৈন্যসজ্জা করুন, এমন যুদ্ধের আয়োজন চাই যে বিদ্রোহকে গুঁড়িয়ে দেখিয়ে দিতে হবে আমার বিরুদ্ধে মাথা তোলার কি চরম পরিণতি।

—যথাজ্ঞা মহারাজ।....

এ’ রকমই এসেছে বন্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও শাশ্বত চিন্তা। কিন্তু ‘বন্যা নিয়ন্ত্রন’ শব্দটাই বন্যা সম্পর্কে এক ভ্রান্ত পরিপ্রেক্ষিতের সূচনা করে। বন্যাকে স্বাভাবিক উপায়ে মোকাবেলা করতে হলে নিয়ন্ত্রনের চেয়ে বিনিয়ন্ত্রনই অনেক বেশি যুক্তিসঙ্গত।

....স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে বেশি জল, তার নামই তো বন্যা। এই জলের সুষ্ঠু বিলি-বণ্টন ব্যবস্থাতেই রয়েছে বন্যার সমাধান। তাকে চোখ রাঙিয়ে চাবুক হাতে বাগে আনার চেষ্টা করতে গেলে বন্যা মুচকি হেসে মানুষকে বলে, কি হে, তুমি না সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব, বড়াই তো কম নয়, তা থাক্, বেশ বোঝা গেছে তোমার মুরোদ-কেন্দানি ; বড়-সড় কথা তা’ নয় একটু-আধটু এবার থেকে কম-ই বললে.... ।

বন্যার আচার-আচরণ এরপর নিশ্চিত ক্ষ্যাপাটে।

দারুন উৎসাহ বোধ করি এ’ চিন্তা মাথায় আসাতে। রিণিকে খুন করেছিল যে, তাকে চেনার চেষ্টায় আরো গভীরভাবে সচেষ্ট হই। যে ঘাতক নির্মমভাবে মেতেছে সহস্র জীবন লুটের খেলায়, দিকে দিকে ছড়ায় কান্নার রোল, জনপদকে নিমেষে পরিণত করে শ্মশানে, তাকে জানতে মনে উত্তেজনা জাগে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের ‘লাইফ এ্যাণ্ড এক্সপেরিয়েন্স অব এ বেঙ্গলি কেমিষ্ট’ বই এর সেকেণ্ড ভল্যুয়মের বারো সংখ্যক লেখাটি গভীর মনোযোগ নিয়ে পড়তে থাকি। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৩৫ সালে।

“উত্তর বাংলার ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতির কথা আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলেছিলাম, কিভাবে রেলপথ তৈরীর জন্য নদীর স্বাভাবিক গতিপথকে অবহেলা করে দু’ পাড় বেঁধে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি জলের স্বাভাবিক প্রবাহের জন্য যেটুকু খোলা মুখ প্রয়োজন তাও রাখা হয় নি। রেলপথের জন্য কম খরচে সোজাসুজি যোগাযোগ ব্যবস্থা

করার কথা ভাবা হ'য়েছে। নদীর ওপর দিয়ে রেল লাইনের জন্য ব্যয়-সাপেক্ষ সেতু তৈরি করা হয় নি অথবা জায়গা বিশেষে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে। এরই ফলে জল জমে জেলাগুলি পড়েছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপে। আর যেখানে বন্যা এড়ানো সম্ভব ছিল সেখানেও অনেক জেলার মানুষই পড়েছে বিধ্বংসী বন্যার কবলে।"....

রাত বাড়ে। উল্টে যাই ইতিহাসের পাতা। সামনে খোলা জানালা। দীপা ঘুমিয়ে পড়েছে। বাতাস একটু গুমোট। বহু দূরে তাকাই। খুব ম্লান চাঁদ, হাসপাতালে শোয়া রিণির মুখের মতো করুণ। অনেক দূর থেকে স্পষ্ট ভেসে আসছে একটা সাবেকী রেল ইঞ্জিনের ঘ্যাসটাং ঘ্যাসটাং শব্দ। নিঝুম রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে ভেঙে ক্লান্ত যেন কোন চৌকিদার ;—কতদিন চৌকিদারের হাঁক শুনি না। গভীর রাত। নিদ্রার কোলে ঘুমানো পৃথিবী। একটা মানুষ শুধু নিদ্রাহীন। শান্তিকে জেগে পাহারা দেয়, এক জাগর পিতা।

....আমার শৈশবে দেখা গ্রামে, রূপোকাকা ছিলেন গ্রামের চৌকিদার। কিংবদন্তী ছিল উনি রাতে জেগে থাকেন বলে গ্রামে চোর-ডাকাত তো দূরের কথা এমনকি ভূত-পেরেতও গাঁয়ের ত্রি-সীমানায় ঘেষতে সাহস পেত না। এক আশ্চর্য সুরে তিনি প্রহরে প্রহরে হাঁক দিতেন—রাত জা—গে....হো-শি-য়া-র....। আকাশে ঝড়-বাদলের লক্ষণ দেখলে কিংবা নদীর ফুঁসে ওঠার আশঙ্কা,—উনি চোখা বর্শার মতো গলা চড়াতেন – ঝড় আ-সে, হুশিয়ার—ঐ বান আসে ...। বিপদ বেশি দেখলে তার গলার স্বর দ্রিমিদ্রিমি দুন্দুভি, —শুরু করে দিতেন মহা তোলপাড়।

১৯২২-এর তিস্তার বন্যার গল্প শুনেছিলাম তার কাছে। ১৯৩১-এ ব্রহ্মপুত্র নাকি জেগে উঠেছিল রুদ্র ভৈরব। পৃথিবীতে ঘনিয়ে এসেছিল মহাপ্রলয়। রূপোকাকা তখন একটা দামী কথা বলতেন,

তখন বুঝি নি, এখন গুরুত্ব দেই। —রাজা পাপী হলে এসব হয়। প্রজা মরে রাজার পাপে।....

প্রফুল্লচন্দ্রের লেখায় আবার চোখ রাখি—"কলকাতার শহরতলীর জল জমার কথাই ধরা যাক—উত্তর কলকাতার কাছেই দমদম, বাগুইর ও রাজারহাট থানার অন্তর্গত পঞ্চাশ থেকে ষাটটি গ্রামের আশি থেকে পঁচাশি বর্গমাইল বিস্তৃত এলাকা বর্তমানে জলের তলায়। প্রায় ষাট হাজার মানুষ, যার মধ্যে সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশই মুসলমান, নিসম্বল হতে চলেছে। ওদের কুঁড়ে ঘরগুলি যেন জেগে আছে দ্বীপের মত, গবাদিপশু মরে যাচ্ছে খাদ্যের অভাবে ; খাদ্য শস্য নষ্ট হচ্ছে, কেউ আস্তানা নিয়েছে মাচার ওপর। এবারের মতো ভয়ঙ্কর না হলেও গত বার-তের বছর ধরেই এই অঞ্চলে জল জমে। ১৯১০ সালের আগে এই অঞ্চলে জল নিকাশের সাত-আটটি নির্গমন পথ ছিল। কিন্তু ঐ মারাত্মক বছরটিতে নৌ চলাচলের জন্য করবিভাগ একটি খাল খনন করে। এই খালটি সরাসরি অনেক নির্গমন নালার ওপর দিয়ে চলে যায় এবং জলতল ঠিক রাখার জন্য নির্গমন পথের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হয়।"....

দীপা ঘুমোচ্ছে। দীপা একদিন একটা মজার কথা বলেছিল—জানো, প্রতিবছরই কতগুলো লোক দল বেঁধে ভিক্ষে করতে আসে—প্রত্যেকেই ওরা প্রতিবছর একটা গান গায়। একই কথা ; একই সুর—'বন্যার জলে ভেসে গেছে দেশ, আমরা সবাই রিক্ত হে / এসেছি তোমার দুয়ারে জননী, দাও গো মা কিছু ভিক্ষা হে।'.... গানের সুরটা ডি এল রায়ের 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে মা তুমি ভারতবর্ষ'-র মত। নিখাদেও সুর একই রকম—'ভেঙে গেছে কুঁড়ে, ভেঙে গেছে সব, ভেসে গেছি মোরা, মরেছি যে সব / এসেছি তোমার দুয়ারে জননী, দাও আমাদের ভরসা হে....।'

আমি দীপাকে জানাই—হ্যাঁ ঠিকই খেয়াল করেছ। মেদিনীপুর প্রভৃতি কিছু জায়গায় প্রতি বছর বন্যা অবশ্যম্ভাবী; বলতে পার একেবারে 'মাস্ট'। ওসব অঞ্চলের মানুষ বহুকাল থেকে দেখে আসছে চিরন্তন একই ঘটনা। একরকম বংশ পরাম্পরায় এ গান হয়ে গেছে তাই এখন ওদের নির্মম জীবন-গীতি—মর্মন্তুদ জীবনের গান।

""দিয়ে আমিও একটা মজার কথা শোনাই দীপাকে। গল্পটা শরৎ চাটুজ্জের। বর্মা থেকে এসে উনি স্থায়ী আস্তানা গেড়েছেন পানিত্রাসে। শরৎবাবুর চোখে পড়ে একটা মজার ঘটনা। রাস্তায় কারো সঙ্গে দেখা হলেই জিজ্ঞাসা,—কবে ভাত করেছেন? কি ব্যাপার? কুশল বিনিময়ের প্রথম ধাপেই এ ধরণের প্রশ্ন! পরে উদঘাটিত হল রহস্য। আসলে তখন ওখানে ম্যালেরিয়া প্রত্যেকের নিত্যসঙ্গী। তাই রাস্তায় বেরোনো মানেই সুস্থ হয়ে ওঠা ও স্বাভাবিক ভাবে ভাত পথ্য করা।

দীপা দারুন মজায় প্রাণভরে হেসে ওঠে।

হাসিতে অংশ নিয়ে আমি আমার মজার কথা শোনাই। বুঝলে, ঠিক অনেকটা একই কাণ্ড মেদিনীপুরের ঘাটাল, দাসপুর, ময়না প্রভৃতি অঞ্চলে। বর্ষা ছাড়া অন্য কোন সময় কারো সঙ্গে দেখা হলে উৎসুক জিজ্ঞাসা—কি, বানের ওপরে?

দীপা ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করে, মানে?

—মানে হল, হয়তো প্রশ্নকর্তা জানতে পেরেছেন কেউ ঘর বানিয়েছে বা সংস্কার করেছে। তাই তিনি জানতে চাইছেন বন্যায় গতবার যতদূর জল উঠেছিল তারও উঁচুতে এবার ঘর করা হল কি না? ওখানে সংগতিশীল লোকেরা এ' ভেবেই ঘর তোলেন, অমুক সালে জল অতটা উঠেছিল, নূতন ঘর তৈরী করা হল অত সালের বানের ওপরে।

দীপা কৌতুক পেলেও বুঝি ভেতরে ভেতরে এবার গম্ভীর।

আমি বাংলার এক বিবেকের কণ্ঠস্বর পড়ি। ঐ লেখাতেই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র লিখছেন—"মেদিনীপুরে যা ঘটেছে, সে ব্যাপারটাও এই রকমই।—খাসমহলের প্রতিরক্ষা ও জমিদারদের শস্যক্ষেত্র বাঁচানোর জন্যে বাঁধ তৈরিও এই দুর্দশার অন্যতম কারণ। সরকার এবং স্থানীয় জোতদারদের স্বার্থপরতা ও চরম ঔদাসিন্য এই দুর্দশা ডেকে আনছে। মেদিনীপুর ভৌগলিক অবস্থানে উড়িষ্যার কাছাকাছি এবং মেদিনীপুরের খালগুলি উড়িষ্যায় গিয়ে পড়ে একে চিরবন্যার দেশে পরিণত করেছে।....আসামের সাম্প্রতিক ভয়াবহ বন্যা নিসন্দেহে প্রকৃতির সর্বনাশা খেয়াল হলেও এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক কমানো যেত যদি জলনিকাশের পথ খোলা থাকত।"

....বন্যা জল-বিদ্রোহ। এক মহা বিদ্রোহ। কেন এই বিদ্রোহ? এক বাঙালী রসায়নবিদের জীবন ও নিরীক্ষার পাতায় বুঝি পেয়ে যাই হদিশ।—"রেলপথ অনেকক্ষেত্রে স্রোতস্বিনী নদীপথ অবরুদ্ধ করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে দক্ষিণ-বাংলা খুলনার শাখা উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রবাহিত অনেক নদী খালবিলের ওপর দিয়ে সেতুর মাধ্যমে যোগাযোগ স্থাপন করায় নদীর গতি সেতুর থামে অবরুদ্ধ হয়েছে। বাংলায় রেলপথ আশীর্বাদ স্বরূপ হলেও প্রাকৃতিক অবদান নদীর বিনিময়ে আমরা তা পেয়েছি। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী এমন কী ইংল্যাণ্ডেও রেলপথ জলপথের পরিপূরকমাত্র। এই সমস্ত দেশে নদীর উন্নতি সাধন ও নিয়ন্ত্রনে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়। কিন্তু বাংলাদেশে নদীর ওপর রেলপথের বিপরীত প্রভাবের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি এবং এর জন্য যে ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে তার বিরুদ্ধেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয় নি।.... নদ-নদীর ভৌত অবস্থা, খরস্রোতা বা মন্থর, মুমূর্ষু বা মৃত, জোয়ার ভাঁটা খেলা বা না খেলা নদীর বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা প্রয়োজন।"

পড়তে পড়তে গভীর রাত। কখন চোখের পর্দা জানি না ধীরে ধীরে নেমে গেছে। গভীর ঘুমে আমি স্বপ্ন দেখি,—উত্তেজনা স্তব্ধ এক গম্ভীর আদালত। বিচার চাইতে এসেছে বেলেঘাটা থেকে হলধর ঘোষ, সাল ১৯১৩। বিচারপ্রার্থী কলকাতার কত মানুষ।—মহামান্য আদালত,....।

সাল—১৯২২, উত্তরবঙ্গ, থেকে আসছে হাজার হাজার মানুষ, রাক্ষুসী তিস্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে। ১৯৩১—ব্রহ্মপুত্র অববাহিকা থেকে কান্নার ঢল। ১৯৩৫—রাজারহাট থেকে হাজার হাজার আমিনা বিবি, দুখু শেখ কান্নায় বোবা হয়ে বলতে এসেছে হুজুর,....। ১৯৪৩ এর আগষ্ট, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ—সবাই কাঁধে করে যেন বয়ে নিয়ে এসেছে এক নিথর শোক। ১৯৫৪, ১৯৫৫, ১৯১৩—কান্না এখন দুরন্ত অশ্রুর বান, হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছে আদালতে। ১৯১৩—হাজার মূক ও পাষাণ-প্রতিমার সারিতে দাঁড়িয়েছি আমিও, দাঁড়িয়েছে দীপা।

দীপা উন্মাদিনীর মত চিংকার করে হঠাং বলে ওঠে—ধর্মাবতার, আমি সন্তানহারা এক মা বলছি, আমাকে ফিরিয়ে দিন আমার রিণিকে....।

উঁচু আসনে বসে বিচারক। নীচে দু হাত বাড়িয়ে প্রার্থনার উচ্চারণ, সেলুলয়েডে যেন ধরা এক স্থির চিত্র অথবা মূক ভাস্কর্য। হাজার হাত ওপরে উঁচানো। মা চাইছে সন্তান, বিধবা চাইছে স্বামীকে, স্বামী স্ত্রীকে। লক্ষ লক্ষ প্রার্থিত হাত।—'ক্লোজ শট' ক্রমশ দূরে যাচ্ছে—পর্দা জুড়ে বিশাল ক্যানভাসে তারপর অগণ্য প্রার্থী হাত—জীবন্ত আর্তি। এক সময় সব মুখ এক, সব শুকনো চোখ একাত্ম, সব খাঁ খাঁ বুক সমবেত। প্রচণ্ড কাঁপছে মূর্তিগুলো। স্তব্ধতার ঠোঁট ভীষণ কাঁপছে। এক সময় ভয়ঙ্কর এক গোলাফাটানো

আওয়াজ, সমবেত হাত উত্তোলিত এক নিশানা চিহ্নিত করে—ধর্মাবতার, ঐ সেই বর্বর ঘাতক—ওর নাম বন্যা।

বিচারক আরো গলা চড়িয়ে গম্ভীরভাবে নির্দেশ উচ্চারণ করেন, অর্ডার—অর্ডার....।

মন্ত্রোচারণের ভঙ্গীতে তারপর তাঁর কণ্ঠস্বর—"দি রিয়েল কালপ্রিট ইজ নট হি, মি থিংক—দি ফ্লাড। অন দি বেসিস অব ক্লিয়ার সানলিট এভিডেন্স, এ্যাণ্ড নট বিয়িং ক্লাউডেড বাই এনি ডিল্যুশন অর ডাউট, আই ফার্মলি আইডেনটিফাই দি ক্রিমিন্যাল, রেড ইন টুথ এ্যাণ্ড ক্ল—দি কনভিকট ইজ........।

(পনেরো)

—মনে করে দেখুন তো বন্যা হয় নি এমন দুটো বছর-ও এদেশে কখনো ফাঁক গেছে কি না? আমার নূতন বন্ধু আলোক ভদ্র আমাকে প্রশ্ন করেন।

আমি চিন্তা করতে থাকি একটা বছরও কি খবরের কাগজ বর্ষায় হয়েছে মেঘদূত বা মেঘমল্লার? মনে হয়, না। কবিতার বই খুলতে চেষ্টা করেছে সে, কবির বাণী নিয়ে কণ্ঠে ধরতে চেয়েছে সুর, কিন্তু অশ্রুতে ভেজা সব অক্ষর কালো। বর্ণমালা সামিল মৃত্যু মিছিলে। সুরে বেজেছে শোক-গাথা।

রেডিও নিয়ে তো মস্করা, ওদের লাইব্রেরিতে তোলাই থাকে বাদল-মরশুমের ক্যাসেট, কোথায় কোথায় বন্যা, কত এলাকা জল প্লাবিত, বাঁধ ভেঙেছে কটা, লাল সঙ্কেত-হলুদ সঙ্কেত, ক্ষতি-মৃত্যুর খতিয়ান, বর্ষা আসার সঙ্গে সঙ্গে রেকর্ডারে বাজিয়ে দেওয়ার অতি চেনা রেওয়াজ; খাঁটি গড্ডল প্রবাহ।

অধ্যাপক ভদ্র শান্ত গলায় বলে নেন—আপনার চিন্তার জের

টেনে আগে একটা কথা বলি,—দিন যাচ্ছে ক্রমশই বাড়ছে বন্যার ব্যাপকতা। পশ্চিমবঙ্গের হিসাবটাই দিই। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জলসেচ ও জলপথ বিভাগের ১৯১৩-এর তথ্য ধরুন,—উনিশ'শ ষাট-বাষট্টিতে যেখানে রাজ্যে বন্যা প্লাবিত এলাকার আয়তন ছিল ছ' হাজার সাড়ে তিন'শ বর্গ কিলোমিটার, উনিশ'শ ছিয়াত্তর-আঠাত্তরে তা দাঁড়িয়েছে, জানেন কত? —ছত্রিশ হাজার কুড়ি বর্গ কিলোমিটার।

আমি অন্য হিসাব মেলাই, পশ্চিমবঙ্গের আয়তন কত?—সাতাশি হাজার আট'শ তিপ্পান্ন বর্গ কিলোমিটার, তবে.... ?

আলোকবাবু এবার তথ্য দেন—উনিশ'শ তিপ্পান্ন সালে ভারতে বন্যাজনিত ক্ষতির পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি চার লক্ষ টাকা। উনিশ'শ আটাত্তরের হিসাব শুনুন, ওটা বেড়ে দাঁড়ায় একশ 'ন কোটি টাকা। পশ্চিমবঙ্গে উনিশ'শ তিপ্পান্ন থেকে আটষট্টি সালের মধ্যে বন্যাজনিত গড় বাৎসরিক ক্ষতির পরিমাণ ছিল চোদ্দ কোটি তেষট্টি লক্ষ টাকা। এর মধ্যে একবার সর্বোচ্চ ক্ষতির পরিমাণ ছিল ছিয়াশি কোটি সাত লক্ষ টাকা। শেষ হিসাব শুনুন, তিরাশি-চুরাশিতে ক্ষতির পরিমাণ প্রায় চারশ কোটি টাকা। সারা দেশে ঐ সময়ে গড়ে দু'শ দশ কোটি টাকা। পঁচাত্তর সালে চার হাজার কোটি টাকা। যদিও এ'সব সব সরকারী হিসাব-নিকেশ।

আমি বিষয়ের গভীরতা মাপার অনর্থক চেষ্টা করি। মুখ থেকে আচম্বিতে একটা শব্দ বেরোয়, —ইংরাজী শব্দ, হরিবল।

আলোকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলেন—জানেন, পঁচাত্তর সালের হিসাবই যদি ধরি, তা দিয়ে দেশে বোকারোর মতো চার-চারটে ইস্পাত কারখানা বানানো যেত। ঐ সময়ের মধ্যে শস্যের যে ক্ষতি হয়েছে, তা দিয়ে গোটা পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি মানুষকে এক বছর এক মাস দু' দিন রেশন দেওয়া যেত। আর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কথা যদি ভাবি, তবে দেখা যাবে শুধু আটাত্তরের বন্যাতেই পশ্চিমবঙ্গের দু' কোটি

ছ' লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সে বছর গোটা ভারতে মোট ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ছিল পাঁচ কোটি তিরিশ লক্ষ। মৃতের সংখ্যা কয়েক হাজার।

আমি উত্তেজিত হয়ে উচ্চারণ করি—এ ড্রেড এনিমি।

আলোকবাবুও খুব উত্তেজনায় বলে ওঠেন—অথচ দেখুন, কি আশ্চর্য, আমরা ভাবতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি, এটা নিয়তি, এটা দৈব। বন্যা হবেই হবে, ভগবানের মার, কেউ একে রোধ করতে পারবে না। এ' সর্বনাশা চিন্তাই চরম সর্বনাশ ঘটিয়ে দিয়েছে।

আমি চোখ বুজে এক অন্য ছবি মেলাই। প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্ব্বে নিম্ন ইউফ্রেটিস উপত্যকার উর নগর, সিন্ধু উপত্যকার মহেঞ্জোদারো, গঙ্গা-শোন ও গণ্ডক নদীর মিলনস্থলে পাটলিপুত্র বন্যা-প্লাবনে ধ্বংস হয়েছে। প্রথমে সলিল সমাধি, পরে বিপুল পলির তলায় কবরে গেছে এ'সব শহর।

অধ্যাপক ভদ্র গুন গুন করে গান ধরেন। সুর ভাঁজতে ভাঁজতে মাঝখানে বলে নেন,—হোয়াংহোকে একসময়ে চীন দেশে বলা হত অশ্রুর নদী। হোয়াংহো অববাহিকার মাটি চীন মুক্ত হবার আগে ভিজে থাকত অসংখ্য শ্রমজীবী মানুষের রক্তে আর চোখের জলে। এক লোকগীতিকার গানে বেঁধেছিলেন মানুষের দীর্ঘশ্বাসকে এ'ভাবে,—কি বিশাল এই হ্যাইহো নদী / যার নামেই শুধু সঞ্চার হয় ক্রোধ / দশের মধ্যে ন বছর-ই বন্যা / দুঃখ আর কান্না তাকে করে না রোধ / 'নদীকে পোষ মানাতে হবে', আমলারা ছাড়ে হুঙ্কার / গরীব চাষীর টাকা তুলে / ভরে শুধু নিজেদের থলে / হায়, কবে শেষ হবে চোখের জল / কবে পূব আকাশে উঠবে টকটকে লাল সূর্য ?....

আলোকবাবুর গানের গলা অপূর্ব। গণ সংগীতের ঢং-এ গাওয়া সাবলীল গায়কীকে তারিফ করি।

কিন্তু আলোকবাবু নিজের কথাতেই তন্ময়। তিনি বলে যান,

জানেন, কিভাবে চীনের মানুষ এই দুঃখের নদীকে সুখের নদী গড়ল, সে এক আশ্চর্য ইতিহাস। চীনের প্রাচীন মানুষেরা সমস্ত পুরোনো অভিজ্ঞতার সার সংকলন করে বন্যার পূর্বাভাস দিত। এটা খুব ইন্টারেস্টিং। যেমন ওঁরা গাছপালার বৃদ্ধি দেখে কিংবা ফুল ফোঁটার সময় পর্যালোচনা করে তাদের নানা ধারণা গড়ত। নদী যখন ফুলে ফেঁপে উঠত তখন তারা বৃষ্টি, ঝড়কে উপেক্ষা করে নদীকে অধ্যয়ন করত।

—হ্যাঁ সব দেশেই দি ওল্ড ওয়াইজ মেন অব দি পাস্ট নেচারকে স্টাডি করে এ'রকম বহু ধারণা গড়েছিলেন যা খুব মূল্যবান ছিল। আমাদের এখানে খনার বচন প্রভৃতিতেও এ'রকম অনেক দামী অভিজ্ঞতার কথা আছে। আদিবাসী সমাজেও এ'রকম পর্যবেক্ষণের ফসল কম নয়। দু' একটা উদাহরণের কথা জানি। যেমন নাগাল্যান্ডের আদিবাসীরা বিশ্বাস করে, ইঁদুর যখন বাঁশের তেউর অর্থাৎ শিষ মুকুলটা খেতে থাকে তখন ওরা নিশ্চিত, সামনে কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসন্ন। সংস্কার নয়, একরকম দাঁড় কাক যখন ভীষণ স্বরে প্রায়শ ডাকতে থাকে, লক্ষ্য করা গেছে, তাকে অনুসরণ করেছে কোন দুর্যোগপূর্ণ ঘটনা। উই এর জাঙ্গাল ওড়া মানেই ভারী বর্ষণ আসন্ন, এতো প্রায় অনেকেরই জানা। চীনেই শুনেছি, কয়েকবছর আগে এক মহা ভূমিকম্পের অনেক আগেই এক ধরণের লাল পিঁপড়ের দুর্লভ অভিযান ও নানা কীট পতঙ্গের গতিবিধি দেখে তথাকথিত অশিক্ষিত মানুষরা বলে দিয়েছিলেন, ভূমিকম্পের আশঙ্কার কথা। বিজ্ঞান ও নূতনকাল যদিও এগুলোর হয়তো বিশেষ মূল্য দেয় না। কিন্তু....। আমি শ্রীভদ্রের কথা প্রসঙ্গে এ'সব তথ্য যোগ করি

আলোকবাবু সঙ্গে সঙ্গেই বলেন,—মজা কি জানেন, হোয়াংহো বাঁধার সময় এসব প্রকৃতি-অধ্যয়নকে অত্যন্ত মূল্য দেওয়া হল।

নদীকে আগাগোড়া কয়েক বছর লক্ষ্য করা হল। কাজটা খুব সহজ ছিল না। সমগ্র কর্মীবাহিনী নানাভাবে ভাগ ভাগ হয়ে মাসের পর মাস নদীকে লেখা-পড়ার মতো করে পড়ল। এ' ব্যাপারে তারা দু' পারের মানুষ এবং ঐ পুরোনো জ্ঞানী-প্রবীণদের নানা অভিজ্ঞতাকে মিলিয়ে মিলিয়ে নিল। সব কিছুর সমন্বয় ঘটিয়ে তারপর ছক বাঁধা হল নদীকে তার খেয়ালী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বইতে দেবার। পরিকল্পনা রচিত হল সেভাবেই নগর-জীবনকে বিপদমুক্ত রাখা। চণ্ড নদী বলতে পারেন তুষ্ট হল মানুষের এই নয়া সাধনায়। পুরোনো জ্ঞানের, চিন্তার সঙ্গে সেখানে বিজ্ঞানের প্রগতি-চিন্তার ঘটানো হয়েছিল অপূর্ব সমন্বয়।

সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন অচিন্ত্যবাবু, 'টেনাসিটি', সংকল্প ও সততা, তা আমাদের মধ্যে কোথায়? মুক্ত চীন বুঝেছিল ঐ নদী সমস্যার সমাধান না হলে দেশের অর্থনীতির মোড় ফেরানো কখনই সম্ভব নয়। তাই ডাক আসার সঙ্গে যার যা ক্ষমতা ছিল তাই সম্বল করে সবাই এগিয়ে এল। মাও-সে-তুঙের লেখা 'বোকা বুড়োর পাহাড় সরানো' গল্পে উদ্বুদ্ধ মানুষ নদীর পুরো অববাহিকা জুড়ে আশিটা বড় ও মাঝারি জলাধার, দেড় হাজার ছোট জলাধার তৈরী করেছে। চার হাজার কিলোমিটার নদীপথে পরিবহন ও যাতায়াত ব্যবস্থা চালু করেছে। সাড়ে চার হাজার বাঁধ বেঁধেছে। দেড় লক্ষ খাল খুঁড়েছে। বিপ্লবী চেতনা নিয়ে তারা পাঁচ হাজার কিলোমিটার বাঁধ জুড়ে একের পর এক ছায়াপথ তৈরী করেছে নিজের হাতে! একশ সত্তর কোটি ঘনফুট মাটি সরিয়েছে শুধু হাত দিয়ে....। আমি বিস্ময়ে প্রশ্ন করি—বলেন কি হাত দিয়ে? কেবল খালি হাতে?

—হ্যাঁ, কারণ শীতের কনকনে ঠাণ্ডায় কিংবা বসন্তের জমে থাকা বরফে শক্ত লোহার কোদালও ঢোকানো ছিল মুস্কিল। কৃষক-শ্রমিক

আর বিজ্ঞানীদলের কাছে ছিল এটা একটা কঠিন লড়াই জেতার সংকল্প। হার মেনেছে অবশেষে শক্ত পাথর, বরফের হাজার স্তরকে ওরা গলিয়েছে তেজ আর ঘামে।

বিহ্বল আমি উচ্চারণ করি—আশ্চর্য। আলোকবাবু গলায় আবেগ জড়িয়ে বলেন, আসল কথা কি জানেন, মুক্ত হওয়ার পর ওরা ধরতে চেষ্টা করেছে দেশের উন্নতি ঘটানোর পথে প্রথম ও প্রধান বাঁধাটা কোথায়? ওটাকে সমাধান আগে না করে অন্যভাবে আগানো তো নিরর্থক। নিশ্চই আপনি, লেনিন কেন দেশব্যাপী নিবিড় বিদ্যুতায়নের ওপর সবচেয়ে বেশী জোর দিয়েছিলেন এবং কি দুরূহ লড়াইয়ে তা সম্ভব করা হয়েছিল তার ইতিহাস পড়েছেন? আমি সম্মতি জানিয়ে ঘাড় নাড়ি। —তবে দেখুন, রোগ শরীরে রেখে তো আর সুস্থ শরীর আশা করা বৃথা, এ সহজ কথা আমরা কোথায় ধরতে পেরেছি! অবশ্য....।

আমি ইতিহাসকে মনের মধ্যে এনে জীবন্ত করে তার মহিমাকে মুগ্ধ হয়ে দেখে চলি,—রুশ বিপ্লব—চীনের মুক্তি—নূতন পৃথিবীর অভ্যুদয়। গভীর প্রশ্বাসে ভারী বুক হাল্কা করি—রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?

আলোকবাবুকে প্রশ্ন করি—বন্যা নিয়ন্ত্রণে দেশী বিদেশী স্বার্থের নানা খেলা সম্বন্ধে আপনি একসময় আলোচনা কববেন বলেছিলেন, সে ব্যাপারে যদি কিছু বলেন....।

এ' বিষয়ে আলোচনা উঠেছিল অন্য একদিন। রিণির মৃত্যুর পর আমি হয়েছিলাম বন্যা-মনস্ক। সেই সূত্রেই কেমন কেমন করে ভদ্রবাবুর সঙ্গে আলাপ-পরিচয়। উনি কথায় কথায় একটি বিজ্ঞান বিষয়ক সুন্দর মাসিক পত্রিকায় ঐ শিরোনামে একটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, অভিজ্ঞ এ মানুষটি

সেদিন জোর দিয়ে বলেছিলেন, স্বাধীন দেশে আমরা বন্যাকে শাসন করতে গিয়ে বহু ক্ষেত্রে অনেক ভুল রাস্তায় চলেছি। স্পষ্ট দুটো উদাহরণ তিনি হাজির করেছিলেন, এক দামোদর পরিকল্পনা, দুই—অভিশপ্ত ফারাক্কা ব্যারেজের নির্মাণ। জানিয়েছিলেন যথার্থ বিশেষজ্ঞের মতামত এখানে কিভাবে রাজনৈতিক কিছু ব্যক্তির অপরিণামদর্শিতায় উপেক্ষিত হয়েছিল, তার ইতিহাস। বলেছিলেন—জলও হচ্ছে এখন ব্যবসা। যত বেশী জলাধার, তত জলবিক্রির সম্ভাবনা। কিন্তু বন্যার অতিরিক্ত জল সংরক্ষিত করবার জন্য কৃত্রিম ব্যবস্থা যা হয়েছে ওখানেও বেনিয়া চিন্তা, স্মল ইনভেস্টমেন্ট, লার্জ প্রফিট। যত বা যে জলাধার তৈরী হয়েছে, তা জল সংরক্ষিত করতে পারছে না। অতিরিক্ত জল ক্ষতিকর ভাবে নষ্ট হচ্ছে। এ' ছাড়া পরিবাহ ক্ষেত্র বা 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া'র জল ধরে রাখার ক্ষমতা কমে যাওয়ায় গ্রীষ্মে অনিবার্য হচ্ছে খরা। 'ফ্ল্যাশ ওয়াটার' না আসায় নদীতে জমছে পলি। ক্ষতি আগুন হয়ে ছড়িয়ে যাচ্ছে অন্য এক প্লাবনে।

অধ্যাপক আলোকভদ্র গুরুত্ব সহকারে বলতে লাগলেন—অধিকাংশ ভারতীয় বন্যা নিরোধ প্রকল্পগুলি বিদেশী সাহায্য নির্ভর। এই সব প্রকল্পে সাহায্যটা সাধারণত আমেরিকা নিয়ন্ত্রিত পুঁজি থেকেই আসে। বিভিন্ন নদ-নদী প্রকল্পে মার্কিন ঋণ খাটছে প্রায় আড়াই'শ কোটি টাকা, এছাড়া নানা সাহায্য, যার ফলে প্রায় আশি লক্ষ ডলারের মতো যন্ত্রপাতির কেনা-বেচা। অন্যান্য আর্থিক ঋণগুলো বেশির-ভাগ মঞ্জুর করে ইণ্টার ন্যাশানাল ডেভলপমেন্ট অ্যাসোশিয়েশন। নানা আশ্চর্য আশ্চর্য শর্তে এরা ঋণ মঞ্জুর করে।

—এটা তো বিশ্বব্যাঙ্কের একটা শাখা, তাই না? আশ্চর্য শর্ত কি রকম?

—হ্যাঁ। সাধারণ নিয়মে যে ঋণ দেওয়া হয় তাতে যন্ত্রপাতি

কিনতে হয় নানা মার্কিনী ফার্ম থেকে। এছাড়া টেকনিক্যাল 'নো হাউ' এর সাহায্য দেওয়ার নামে যেরকম পরিকল্পনা রচিত হয় তাতে লাটাই ওদের হাতে। চম্বল পরিকল্পনার ছক তৈরী করে ও কারিগরী কৌশল দেয় লারসের টুবরো কোম্পানি। ৩০ কোটি ফ্রাঙ্ক বা ৬০ কোটি টাকার প্রকল্প। প্রকল্প শুরু হওয়ার মুখে এরা খবর পায়, কোম্পানি ফ্রান্সচেইজ ডি এণ্টারপ্রাইজ ঝিলম প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। ওরা কিছু যন্ত্রপাতি কাজে লাগাতে পারে নি। ঐ কোম্পানির প্রতিনিধি জর্জ কুইরো কায়দা করে ১৪'৯৫ লক্ষ ফ্রাঙ্কে পুরোন যন্ত্রপাতিগুলি লারসেন-টুবরোকে বিক্রি করে। লারসেন টুবরো শেষ মুহূর্তে মর্জিমাফিক নিজস্ব প্রকল্প নূতন করে ঢেলে সাজায়।

— ষ্ট্রেঞ্জ।

—ষ্ট্রেঞ্জ বলে ষ্ট্রেঞ্জ। কেরালার ইদ্দিক প্রকল্প ভারতের অন্যতম বিখ্যাত প্রকল্প। বিদেশী মুদ্রায় ঋণের পরিমাণ ২৭০ লক্ষ ডলার। মন্ট্রিয়লের বিদেশী ফার্ম সারভেয়র নেনিনজার এ্যাণ্ড চেনিভার্ট এখানে এক জটিল পরিকল্পনার ছক নেয়। অথচ তা না করে অনেক কম খরচে, নদী খাতকে না বদলিয়েই এ' প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করা যেত। কাজ ও দীর্ঘ মেয়াদী হত না।

—দেশী স্বার্থের ব্যাপারটা কি ?

—সে তো খুব সহজ কথা। প্রথমত বন্যা হোক, ঘোলা জলে অনেক সুবিধা তোলার নানা সুবর্ণ সুযোগ। এ'ছাড়া নদী নিয়ন্ত্রনের ক্ষেত্রেও কতগুলো অদ্ভুত ইণ্টারেষ্ট খুব কাজ করে। যেমন ধরুন হীরাকুঁদ ড্যাম, ওটি বানানোর প্রকৃষ্ট জায়গা বাছা হয়েছিল টিকিয়া-পাড়ায়, ওতে খরচ কম এবং উপকারও বেশি হত। কিন্তু হৈ হৈ ফেলে দিল মহানদীর চারপাশের ক্ষুদে সামন্ত রাজারা। ওখানে বাঁধ হলে ওদের জায়গা-জমির ক্ষতি। শাসকদল দেখল ভোটে

জিততে হলে এদের বিরূপতায় বিরাট ক্ষতি। অতএব........।
ডি ভি সি বা ফারাক্কার পেছনেও আছে এ'রকম অনেক ইতিহাস।

এক নূতন আলো ছড়িয়ে যান আলোকবাবু। মশাল জ্বালিয়ে দেখি, এক বিরাট কারাগার। মানুষ বন্দী জল শেকলে। খুব ভারী সে শেকল। স্পষ্ট হয় বন্দীকারী কে? আর কেনই বা বন্ধন! কোন্ কামারশালায় তৈরী হয় সে বন্ধন! অবশ্য জলবন্দী হওয়ার কারণ বুঝি এটাই প্রধান নয়। মানুষ নিজের অজ্ঞতায়ও শেকল পরে। শেকল পরে কখনো না জেনে, কখনো জেনে অথবা নিরুপায় হয়ে।

কখনো ভাবে শেকল কই? ও'সব ঝুট কথা।

কিন্তু জলশেকল এক আশ্চর্য মায়া-ফাঁদ। ম্যান ইজ চেইনড বাই টিয়ার্স এ্যাণ্ড ওয়াটার। গূঢ় জলশৃঙ্খল। পৃথিবী বেড়ে নৃত্য করে তিনভাগ প্রমত্ত জল।

(ষোল)

ইতিহাসবিদ ডব্লু ডব্লু হাণ্টার গর্ব নিয়ে বলেছেন, ভারতবর্ষে ইংরেজের কৃতিত্ব আধুনিক নগর নির্মাণে। এ'ব্যাপারে তিনি কলকাতার কথা উল্লেখ করেছেন গদগদ ভাবে।

১৬৯০ সনের ২২ আগষ্ট হুগলী নদীর তীরে সুতানুটি গাঁয়ে জব চার্ণক নৌকা ভিড়িয়েছিলেন। গড়গড়ায় গুড়ুক গুড়ুক তামাক টানতে টানতে মনে মনে ভাবলেন, কেমন হয় জায়গাটায় যদি গড়ে তুলি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য কেন্দ্র!

....লেট দেয়ার বি এ সিটি। এ্যাণ্ড দেয়ার এমারজ্ড এ সিটি....।

জমাট আলোচনা-সভা বসেছে একদিন বাড়িতে। আসলে ওটা বৈকালিক আসর। আসরে উপস্থিত সহকর্মী অতীশ। আলোকবাবু মধ্যমণি। বিপ্রর আসার কথা আছে। আসলে বুঝতে পারি, রিণির মৃত্যুর পর ট্রান্সফার নিয়ে আসাতক্ আমার প্রতি আমার শুভার্থীজন

সবিশেষ সহানুভূতিশীল। সেই থেকে নিকট-সঙ্গ ক্রমে ক্রমে নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। সপ্তাহান্তিক আড্ডা পরিণত হয়েছে এক অনিবার্য রেওয়াজে। আড্ডার স্থায়ী সদস্য সংখ্যা চার কি পাঁচ। দ্বার যদিও অবারিত। অর্থাৎ এ্যাডমিশন আনরেসট্রিকটেড। এখানে সুস্বাগত বিশ্বভুবন।

অতীশ উপস্থিত হয়েই হাঁক পাড়ে,—হ্যালো, কলিং সাপ্লাই লাইন....।

দীপাকে রসিকতা করে সে এ'রকম নাম দিয়েছে। প্রথম দিন নামকরণের কারণ ব্যাখ্যা করেছিল। বলেছিল,—নেপোলিওনের মতে যুদ্ধ জয়ের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সাপ্লাই লাইন। লড়াকুরা এগোবে সামনে; পেছন থেকে রসদ যোগান হবে ঠিক ঠিক। আরে, সৈন্যকে তাগদ যোগায় কি খালি অস্ত্র-শস্ত্র? এ'ব্যাপারে রসুইখানার অবদান খুব মূল্যবান। ভেরি ভেরি ইমপরট্যান্ট। হাসতে হাসতে তারপর সিদ্ধান্ত—বলুন, এসব আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক এগোয় কিভাবে, যদি না আসে ঘণ্টায় ঘণ্টায় বা ক্ষণে ক্ষণে চা ও আনুষঙ্গিক! আলোচনার অশ্ববেগ বুঝি বা থামে। অভিযান বুঝি স্তব্ধ।

দীপা সহাস্যে রান্নাঘর থেকে প্রত্যুত্তর অবিলম্বে বাতাসে ভাসিয়ে দেয়—চিন্তা নেই। অভিযান এগোক, সাপ্লাই ঠিক সময়ই পৌঁছে যাচ্ছে। ....ওভার।

অতীশ উচ্ছলভাবেই বলে ওঠে,—ধন্যবাদ মঁশিয়ে থুরি মাদাম, একটু তাড়াতাড়ি, কলেজ থেকে সটান আসা হচ্ছে; খুব টের পাওয়া যাচ্ছে পেটে বাস্তিল ভাঙছে। গুড়গুড় বুঝি ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ....।

এরপর ভাবান্তরে দ্রুত গাম্ভীর্য নিয়ে সে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা, জব চার্ণক মশাই যেদিন ঐ গানের কলি মিলিয়ে বলে উঠলেন—'আমার কোন্ কূলে আজ ভিড়ল তরী, এ' কোন সোনার গাঁয়?'—তা সুতানুটিতে তখন কি ঋতু?

আমি সহজভাবে বলি—আগষ্ট মাস। বাংলা শ্রাবণ হবে।

—অর্থাৎ, কিনা ঘোর বর্ষার সময়। তাই না! আচ্ছা, বাংলার বর্ষায় সুতানুটি চার্ণক সাহেবের কিভাবে মন কাড়ল? উনি কি কবি ছিলেন? বেনিয়ার ছদ্মবেশে কি কোন রসিক সুজন? নাকি তখন কলকাতা জল-প্লাবনে ভাসত না? জল নিয়ে জ্বলিত নয় কলকাতা?....

আমি প্রায় না ভেবেই উত্তর দিই—তুটো হওয়ারই সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় কি?

অতীশের পরবর্তী বক্তব্য, প্রাকৃতিক নিয়মে আকাশ থেকে নেমে আসে বৃষ্টিধারা; তা কখনো কখনো অতিরিক্ত হতে পারে। সর্বত্র জলরাশি। স্বতসিদ্ধ নিম্নগামিতার সূত্রে সে খুঁজবে কোথায় আছে ঢাল, নাবাল জমি বা নিম্নাঞ্চল। এ' ব্যাপারে কোন বাঁধার অর্থ কি? নিশ্চিত জল-বিদ্রোহ, তাই না?

কিছুটা গলা চড়িয়ে তারপরই ওর সরব জিজ্ঞাসা—বলুন, পর্বত গৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী সিন্ধুর উদ্দেশ্যে, কার হেন সাধ্য এবে রোধে তার গতি? আলোকবাবুর দিকেই তার প্রশ্ন এবার সরাসরি—বলুন, কলকাতা নির্মাণের ক্ষেত্রে ঐ ভদ্র হাণ্টারের গর্বের পেছনে মানা হয়েছিল কি এ' সামান্য বৈজ্ঞানিকতার শর্ত? ছিল কি ভাবনায় কোন দূরদৃষ্টি?

আলোকবাবুর স্বভাব এ' রকম, প্রথমে চুপচাপ, তারপর যখন সরব তখন বক্তা তিনি একমেব অদ্বিতীয়ম, আর সবাইকে তখন থাকতে হয় নীরব শ্রোতা।

আসরের প্রধান আলোচনা আজ বুঝি দানা বাঁধবে যে বিষয় নিয়ে তা হচ্ছে,—কলকাতা কেন জলে ভাসে? সে'ভাবেই বুঝি সেতারে মূল সুর ক্রমশ বাধা হতে থাকে। অতীশ ও আলোকবাবু, ভালোই জুটেছেন তুই রাজযোটক। আসরে আজ অনবদ্য যুগলবন্দী।

আমার ভূমিকা প্রধানত বিহ্বল শ্রোতার। একা গায়কের নহে তো গান....যথাসাধ্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে সচেষ্ট হই কবির সে বাণী।

আলোকবাবু আলোচনায় ক্রমশ মগ্ন থেকে মগ্নতর; নিমজ্জমান। ধীরে ধীরে বলা শুরু করেন এভাবে,—ইংরেজ-অভ্যুত্থানের গোড়া থেকেই বাংলাদেশে জমির মালিকানা মানেই আভিজাত্যের মাপকাঠি। জমি মুনাফার কামধেনু। ১৭৯৩-এ লর্ড কর্ণওয়ালিশ জমির ওপর পল্লী-সমাজের সাবেকী সত্ত্ব খর্ব করে সৃষ্টি করলেন ব্যক্তি-সত্ত্বভোগের ব্যবস্থা। সমাজে গুরুত্ব বাড়ল অর্থ-বিত্ত, তথাকথিত প্রতিপত্তির অধিকারী এক ধরণের দেশীয় ভূম্যধিকারীর। এরা কোম্পানি-সৃষ্ট, আপন স্বার্থেই হতে বাধ্য ইংরেজ বেনিয়া তথা সাম্রাজ্যবাদীর অনুগত পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য এ' ধরণের জমিদার তৈরী করবার ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই।

....জমি ধীরে ধীরে চলে আসতে লাগল চতুর ভাগ্যবানদের হাতে। এরা খালি বুঝত টাকা। জগৎ এদের চোখে শুধু কামিনী-কাঞ্চনময়। নামেই এরা জমির ইমানদার, জমির ওপর নেই অবশ্য কোন মায়া-মমতা। মাটিতে এদের পা পড়ে না, তবু এরাই জমির প্রভু বা মালিক।

....এরাও সুকৌশলে উদ্ভাবন করলেন আরেক ব্যবস্থা। তৈরী করে নিলেন মধ্যস্বত্বভোগী আরেক শ্রেণী। যেন-তেন প্রকারে সংবৎসর এরাই যোগাবে জমিদারের ঘরে রাজস্ব বা টাকা। জমিদার মশাই তার থেকে নিজের ভাগ রেখে চুক্তি মতো টাকা মিটিয়ে দেবেন ইংরেজ কোম্পানি বা ওপরওয়ালাকে।

....গ্রাম, গাঁয়ের মাটি ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কহীন, তাদের সুখ-দুঃখের জীবন থেকে শত সহস্র যোজন দূরে থাকা absentee Land Lord-রা আরামে-সুখে দিন কাটায় শহরে, নগরে। এ' ভাবে

গ্রামের টাকা-রাজস্ব যেমন চলে আসত লাগল শহরে, তেমনি জোত-জমির উন্নয়ন, কৃষি ও কৃষকের উন্নতি, বন্যা রোধ, জল নিকাশী কিংবা সেচ ব্যবস্থা, মোট কথা জনকল্যাণে সামান্যতম চিন্তা একেবারেই হয় অবলুপ্ত।

....জমিতে পরবর্তীকালে যারা আসে তাদের রূপও বড় ভয়ংকর, জমি মানেই অবাধ লুটের ক্ষেত্র। রাস্তা-ঘাট তৈরী, বাঁধ নির্মান, খাল খনন এ সব চিন্তা দূর অস্ত। লুটে নাও, লুটে নাও, তড়িঘড়ি যা পারো লোট। মৃগয়ায় যে যত বেশি ক্ষিপ্র, দুরন্ত, ভয়ঙ্কর, কৌশলী এবং সক্ষম সেই তো সবচেয়ে লাভবান, বিজয়ী।....

তু'জনেই তরতর ইতিহাসের রাস্তায়। আলোকবাবু বলেন, সেদিন থেকেই আমাদের চারপাশে গড়ে উঠছিল কারগার ঘোর। রুদ্ধ হচ্ছিলাম আমরা।

—একদিকে শিল্প বিপ্লবের প্রসার, দেশীয় বিভিন্ন শিল্পের ধ্বংস, স্বয়ং সম্পুর্ণ পুরোনো সামন্ততান্ত্রিক গ্রামীণ ব্যবস্থার অবলুপ্তি, অন্যদিকে শুধু গ্রাম-গঞ্জই নয়, ইংরেজ অভ্যুদয়ের পয়লা চোটেই সমস্ত শহর নগরগুলোরও শুরু হয় অন্তর্জলি যাত্রা। লর্ড ক্লাইভের সময়-ও যে মুর্শিদাবাদ ছিল লণ্ডন শহর থেকে বিশালতর, ১৭৮৭-তে যে ঢাকার লোকসংখ্যা ছিল দেড় লক্ষ, ইংল্যাণ্ডে বার্ষিক ৩০ লক্ষ টাকার মসলিন রপ্তানি হত, কুড়ি বছর পর সে ঢাকা থেকে মসলিন রপ্তানির কোন চিহ্ন নেই। মুর্শিদাবাদ, ঢাকা থেকে মানুষের শুরু হয়েছে ভাগ্যান্বেষণে দেশান্তরী বা অগস্ত্য যাত্রা। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে একে একে মুর্শিদাবাদ, ঢাকা, কাশিমবাজার, হুগলী, মালদহ ;—সুসংহত গ্রাম-ভিত্তিক নগর-ব্যবস্থা, আরো অনেক কিছু, সব কিছু। দ্রুত জাগছে কলকাতা, জাগছে ভয়ঙ্করভাবে।

আমি শ্রোতা থাকতে থাকতে একটু বক্তা হই। সংক্ষিপ্ত মন্তব্য—মানে, সমস্ত রক্তই মাথায় চালান হওয়ার শুরু। এর অন্তিম ফল

তো করোনারি থ্রম্বোসিস ।....

আলোকবাবু মৃদু হেসে বক্তব্য শুরু করেন—১৭৬৮-তে মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় এলো শাসনকেন্দ্র। ১৭৭০ থেকে কলকাতা হল ইংরেজের ভারত রাজ্যের রাজধানী। ঝেঁটিয়ে মানুষ আসছে তখন কলকাতায়, কেউ আসছে বেনিয়াবৃত্তির লোভে। কলকাতা চিরাগ তখন, আলাদীনের প্রদীপ। বাংলার নবাবের বিরোধী পক্ষের অনেকে আগেই নিরাপদ আশ্রয় বুঝে কলকাতায় গড়েছে নয়া সাকিন। ইংরেজ বণিকের গঠন প্রতিভা ও শক্তির ওপর ভরসা করে, বর্গীর হামলা থেকেও গা বাঁচাতে অনেকে কলকাতাবাসী।

....দেশীয় বণিকদের অবশ্য বিশেষ কোন সুবিধা হল না। ইংরেজ দেশীয় সুবর্ণ বণিক, তন্তুবায় ও অন্যান্য ভাগ্যান্বেষীদের জাত-পেশায় ঘটিয়ে দিল দফা-রফা। দেশীয় ব্যবসায়ীরা অধিকাংশই তখন জমিদারী কিনে, বাড়ির মালিক হয়ে, কোম্পানীর কাগজে পুঁজি খাটিয়ে করতে চাইল অন্তত শেষরক্ষা। আদর্শ নগর নির্মাণ বা নগর উন্নয়নের চিন্তা সহজেই অনুমেয় কিভাবে সম্ভব!....এ' ছাড়া অন্য কথাও বিবেচ্য, এই বাংলার টাকায় যখন লণ্ডনের ঘটছে সমৃদ্ধি তখন এ শহরের উন্নয়ন সাধনে টাকা নেই, ব্যবস্থা করতে হয় লটারি খেলার।

অতীশের কথামত দীপার সাপ্লাই লাইন সদা জাগ্রত। মাঝে মাঝেই ব্যবস্থাদি দেখ-ভালের জন্যে তার সশরীবে আগমন। এ' রকমই এক আবির্ভাবের সূত্রে সমগ্র আসরের কাছে তার ব্যাকুল প্রশ্ন, আচ্ছা একটু বৃষ্টি হলেই শহরটাতে জল জমে, তার নিরসনের উপায় কি আছে কিছু?

আলোকবাবুই উত্তরদাতার ভূমিকায় স্বেচ্ছায় অগ্রণী—মৌসুমী জলবায়ুর এ' দেশে বন্যার সম্ভাবনা, সে সব কথা ভেবে জনপদ গঠন, বন্যা রোধের ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা কখন কিরকম হয়েছে তা হতে পারে এক গবেষণার বিষয়। তবে একটা কথা মোটামুটি বলা যেতে

পারে, বন্যা নিশ্চই যুগে যুগে হয়েছে তবে জ্বলন্ত সমস্যা হয়ে ক্রমেই এই যে তার আত্মপ্রকাশ, বোধহয় তাও ঘটে চলেছে ঐ সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে। ক্রমেই সে সমস্যা ভয়ঙ্কর—তর এবং তমতে গেছে, যাচ্ছে। সমস্যা গভীর থেকে গভীরতর বা গভীরতম।

....ইংরেজ যতই বড়াই করুক, তার আগে এ'দেশে নগরের অস্তিত্ব মোটের ওপর বিকেন্দ্রীভূত। নগর, ঐ অচিন্ত্যবাবুর তুলনা মতো মস্তিষ্কে সব রক্ত চলে আসার ভ্রান্ত বৈজ্ঞানিকতা নয়, গ্রামের নিরক্ত হওয়ার ভাবনা বা বোধও নয়। গ্রামজীবন সুষমবন্টিত সুর্যালোকের মতো একরকম স্বয়ংসম্পুর্ণ, স্বদীপিত, সুসংহত। শহরমুখী হওয়ার প্রয়োজনে ছিল না অনিবার্যতা, অমোঘতা। জনপদ নির্বাচনে তাই সবিশেষ কোন সমস্যাই তত প্রকট বা নিদারুন নয়, যে কপালে যা হয় হোক হবে, বানে ডুবি-ভাসি, এখানে বসত না গাড়লেই চলবে না, গড়তেই হবে, থাকতেই হবে। নদীনির্ভর অঞ্চলগুলোর কথা অবশ্য স্বতন্ত্র—জলে-মানুষে সেখানে আবহমানের অখণ্ড মিতালি। তখন শহর-ও শহর। বেড়ি বাঁধা নয় সে শৃঙ্খলিত প্রমিথিউস। তার ডাল-পালা মেলা বা তার শ্বাস-প্রশ্বাসিত আশে-পাশের পশ্চাৎ ভূমিও নয় জনাকীর্ণ বা রুদ্ধ। তার ক্লেদ নিকাশী ব্যবস্থায় বেপরোয়া খুন-জখমের ঘটনা প্রায় অনুপস্থিত।

....ইংরেজ মহানগর নির্মাণে যে কলকাতাকে বেছে নিয়েছিল ভৌগোলিকভাবে তার অবস্থিতি এমন অংশে যেখানে প্লাবনমুক্ত নগর-জীবন গড়ে ওঠা সম্ভব কি না তা নিয়ে সূচনাপর্বে চিন্তা করা হয় নি এতটুকুও। জল নিকাশের অবশ্য তখনো হাজার পথ বা উপায় খোলা। চতুর্দিকে হাজার বিল-বাওড়, জলা, খাল, প্রান্তিক জমি আর নদীর সঙ্গে স্বাভাবিক বন্ধন। যেমন একটা উদাহরণ দিই। —

এখন যেখানে স্ট্র্যাণ্ড রোড সেখানে ছিল গঙ্গানদী। পরবর্তী-

কালের হেস্টিংস স্ট্রিটের উপর দিয়ে বেন্টিক স্ট্রিট পার হয়ে ধর্মতলা স্ট্রিটের উত্তর দিক দিয়ে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মধ্য দিয়ে ক্রিক রো ও লোয়ার সার্কুলার রোড পার হয়ে কনভেন্ট রোড ও ক্যানাল স্ট্রিটের ভেতর দিয়ে এঁকে বেঁকে উত্তর-পূর্ব দিকে বয়ে গিয়ে বেলেঘাটার খাল-দিয়ে ধাপা হয়ে বিদ্যাধরী নদীতে পড়ত। বিদ্যাধরী তখন বড় ছিল, মাতলা নদীতে পড়ত। এখন মজে গেছে। ইংরেজরা জনপদ বাড়াতে পরে বেলেঘাটা থেকে পোর্ট ক্যানিং পর্যন্ত রেলপথ তৈরী করতে গিয়ে এ'খালকে ক্রমে ক্রমে বুজিয়ে দিয়েছে।....

অতীশ মাঝে যোগ করে,—ক্রিক রো ও ক্যানাল স্ট্রিট তো বর্তমান নামে অতীতের স্মৃতি এখনো বহন করে।

—এ'ছাড়া শুধু দূরদর্শিতা নয়, নগর উন্নয়নে টাকা বা ভাবনা! আলোকবাবু আবার মুখর হয়ে বলেন, শরৎবাবুর 'বামুনের মেয়ে'র একটা ঘটনা হঠাৎ মনে আসছে, একটা সাঁকোর অভাবে খাল পেরোতে গিয়ে লোকের হাত-পা ভাঙছে,—ত্রৈলক্য ও ষষ্ঠিচরণ প্রিয় মুখুজ্জের কাছে এসেছে সাঁকোর জন্য কয়েকটা বাঁশ ভিক্ষা করতে।—কেদার বাড়ুজ্জের 'কালীঘরামি' গল্প,—দক্ষিণেশ্বরে একজন বহিরাগত সাধারণ দিন-মজুর অভিজাত মানুষের বাস দক্ষিণেশ্বরে নিজের রুজি-জমানোর পয়সায় বানিয়ে দিচ্ছে একটা কালভার্ট। ঠাহর করুন, কারা ভাববে কলকাতা হোক প্লাবন মুক্ত! আলোকবাবু এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে একটু থামেন।

অতীশ বিরতিতে মন্তব্য করে—আসলে কলকাতায় বর্ষা মানে সামান্য কয়েকটা দিন জলে জলে থাকা। একটু ভোগান্তি-টোগান্তি হলে বা বাড়লে তার সঙ্গে সমান পাল্লা দিয়ে হৈ-রৈ এর আরেক বন্যা। জল নামলে হঠাৎ জাগরণ-ও থিতু, সুপ্তোত্থিত মুখরতা আবার ঘুমানো। ধীরে ধীরে ঋতু আবর্তনে বিদায় বর্ষা, কলকাতা আবার কলকাতাতেই।

আমি প্রচলিত সরস একটা গল্প স্মরণ করি,—এক বুড়ির ফুঁটো চালের ঘর থেকে বর্ষায় ঢল নামে। বুড়ি চিন্তা করে, চালটা সারাই করা দরকার, কিন্তু এখন তো হবে না, বর্ষা যাক., চালটা সারাতে হবেই। বর্ষা থামে, ঘরে তো জল পড়া বন্ধ। ঘরে যখন এখন আর জল পড়ে না, বর্ষা আসতে আসতে তো আরো এক বছর, ত এত আর তাড়াহুড়ো কিসের! দিন যায়, তাতে কি হয়েছে এখনো তো মাস —দুই—এক মাস,—পনেরো দিন—দু-তিনদিন তো বাকি আছে.... দেখতে দেখতে.... ....।

আলোকবাবু এবারও হেসে ওঠেন। এবার একটু জোরে। হাসে সকলেই। আলোচনা আবার বাঁধা পথে।

—এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে কলকাতা কর্পোরেশনের দায়িত্ব হাতে এসেছিল দেশীয় নেতৃবৃন্দের একাংশের হাতে। কিন্তু অচিন্ত্যবাবু, এবারও আপনার গল্পের উপমা খাসা বলা যায়,—স্বায়ত্ত শাসন পাওয়া মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম দাবী। দেশ আগে স্বাধীন হোক, উন্নয়নের কথা পরে ঢের ভাবার সময় পাওয়া যাবে....।

—'৪৩-'৪৪ এর দুর্ভিক্ষ, বিশ্বযুদ্ধ, মানুষের মধ্যে স্বার্থপরতা, বর্বর লোভ, মানবিক নানা মূল্যবোধের অপমৃত্যু, অর্থনীতি বিপর্যস্ত —কলকাতায় আসছে জনস্রোত।

—দাঙ্গা, স্বাধীনতা, দেশভাগ;—কলকাতা ও তার আশপাশে উদ্বাস্তু-স্রোতের উদ্দাম ঢল। জমির দর হু হু করে বাড়ছে। কলকাতা উপচানো। অসহায় ছিন্নমূল মানুষ; যদি হয় নরক কুণ্ড, বাঁচতে তো হবে। টিকে থাকার আকুতি।

—শেকল ছিল হাতে। একদিন প্রহরী এসে খুলে দেয় বাঁধন। তবে কি মুক্তি? না, সভ্যতার অগ্রগতির কৌশলে হাতে হাত-কড়ার বাঁধার নিয়ম সেকেলে। মুক্ত কারাগার গড়ার উদ্ভাবিত হয়ে গেছে 'মর্ডান কনসেপশন'। আমি এরকমই চিন্তা করতে থাকি।

বক্তা কে জানি না। তিনি বলে যান—অবিশ্রান্ত, অন্তহীন উদ্বাস্তু-স্রোত—পূর্ববঙ্গে জঙ্গী আয়ুবশাহীর দুঃশাসন, আবার বহু মানুষ দেশান্তরী, আসামে বাঙাল-খেদা, পঁয়ষট্টির পাক-ভারত যুদ্ধ, অন্যান্য প্রদেশে বাঙালী শরণার্থী নিয়ে হাঙ্গামা, বাংলাদেশের অভ্যুদয়, ব্রহ্মদেশ থেকে বাঙালী বিতাড়ন ও আরো নানা কারণে মাটির ওপর আছড়ে পড়া এক বিশাল জলোচ্ছাস....।

চারদিক থেকে প্রার্থনা উঠছে—ঠাঁই দাও। 'মাতা ভূমিঃ, পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ'—মাটি মাগো, আমি যে তোমার সন্তান।

....এক ভেসে চলায় শেষ, অন্য ভাসার আবার শুরু।

আড়ালে বসে হাসেন কিন্তু বিধাতা।

(সতেরো)

পুলিশের সাহায্য নেওয়া ছাড়া আব আমাদের কোন উপায় ছিল না।

আমাদের ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জল নিকাশের একটা খালের মতো নিকাশী বড় নালার উপর জনৈক নওলকিশোর গুপ্তা বানিয়েছিলেন নানা কারবারের একটা পাকাপোক্ত ঘাঁটি—মায় খাটাল থেকে কালোয়ারি কারবারের মাঝারি সাম্রাজ্য। আগে জানতাম ওটা খাস জমি, জলা জায়গা। কিন্তু একদিন খবর আসে,—না, না জলার নাকি একাধিক মালিক আছেন, তাদের কাছ থেকে তা কিনে নিয়েছেন ঐ গুপ্তা মহাশয়।

তৎপর খোঁজ-খবরে জানা গেল সব ভুঁয়ো। পুরো ব্যাপারটাই জালিয়াতি। বে-আইনীভাবে ঐ জলা জমির দখল নিয়েছেন ধনকুবের নওলকিশোর। তাতেই রাতারাতি জমি ভরাট ও ফলাও কারবারের সূচনা। ও জমি নিয়ে এর আগে আমাদের মাথা ব্যাথা ছিল একেবারেই অকিঞ্চিংকর। কিন্তু আচমকাই তা হয়ে উঠল একটা

প্রধান ইস্যু। তাতে জড়িত হতে হল আমাদের সবাইকে। হতে হল দ্বন্দ্ব মুখর।

আমাদের প্রধান আপত্তি বা প্রতিবাদ ছিল অন্যকারণে। প্রথমত ও জমির সঙ্গে বসবাসকারী অঞ্চলের জলনিকাশের প্রশ্ন দারুনভাবে জড়িত, দ্বিতীয়ত গোড়া থেকেই জানতাম ওটা খাস জমি। প্রভাতী সংঘ ওটাকে দখলে রেখেছিল পরবর্তীকালে পল্লীর সুষ্ঠ উন্নয়নের ও সর্বসাধারণের স্বার্থে। ওর এক অংশের উঁচু ডাঙাতেই তো প্রভাতী সংঘের সংঘগৃহ। পল্লীর কচি-কাঁচার স্বর্গপুরী।

সংগঠিত করা হল এর বিরুদ্ধে প্রথমে পল্লীতে সভা-সমিতি, সমাবেশ। তারপর প্রশাসনিক নানা মহলের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা। অঞ্চলে দানা বাঁধে ক্রমশ জোরদার সচেতনতা—না, ঐ জমি নওল-কিশোরকে কুক্ষিগত করতে কিছুতেই দেওয়া হবে না। আদালতেও বিচারপ্রার্থী হয় প্রভাতী সংঘ ও পল্লীর উন্নয়ন সমিতি। মহান এই সোরগোলের বলিষ্ঠ সেনাপতি অবশ্য ঐ বিপ্র। বিপ্রদাসের খাওয়া নেই, ঘুম নেই, অফিসে ঘন ঘন কামাই, বিস্তর ছুটোছুটি। আমাদের অনেকের অবস্থাও তথৈবচ। বিপ্র বিরাট কৃতিত্বের সাক্ষ্যর রাখে, এ' ব্যাপারে মোটের ওপর সমস্ত মানুষকে দলমত নির্বিশেষে একজোট রাখায়। গোটা মহল্লা একজোট, এক প্রাণ। যদিও আছেন দু'একজন অন্যমনা। সংখ্যা অবশ্য তাদের নিতান্ত কম।

আদালতী লড়াইয়ে অবশেষে আমাদের জয়। মাঝে উটকো বিপদ দেখা দিয়েছে। লক্কাকে টাকা দিয়ে কিনেছে নওলকিশোর গুপ্তা। লক্কার মতো কিনেছে অনেককে। শোনা যায়, উচ্চতম আদালতে যাওয়ারও নাকি সে পরিকল্পনা ভাঁজছে। ইতিমধ্যে রঙ্গমঞ্চে হঠাৎ আবির্ভূত লক্কা। দলবল নিয়ে এসে সে অঞ্চলে

ঘনঘন নানা হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে থাকে। প্রথমে একটু বিস্ময়, পরে এর গূঢ় কারণ জানতে আগ্রহী হই আমরা।

সেই সূত্রেই একদিন আমি, বিপ্র ও আরো কয়েকজন মনস্থির করি লক্কার সঙ্গে জরুরী একটু বসা দরকার। বুঝিয়ে বলতে হবে, আমরা যা করছি তাতো পল্লীবাসীর বা দশজনের স্বার্থে। ক্লাব-সংঘ তো এক অর্থে আমাদের ফুঁসফুঁস। এ'ছাড়া নওল কিশোর প্রবহতা জলনিকাশের একটা স্বাভাবিক নালা বন্ধ করে গোটা অঞ্চলের বুকে সৃষ্টি করেছে এক ভীষণ বিপদের, জলে ভাসতে হবে সকলকে, অঞ্চল জলবন্দী হবেই। আমরা স্থির করলাম লক্কাকে তা সবিশেষ বুঝিয়ে বলব। এ'ছাড়া চরম পথে চলার আগে আমাদের মধ্যে এক অন্য বোধ ছিল, স্পষ্টভাবে জানতাম, লক্কা এরা কোন সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশে এ'রকম ঘটনায় মানুষের নিশ্চিত শত্রু হতে পারে না। এরা এক ট্রাজেডি। সভ্যতার বিষ গিলে গিলে এরা নীলকণ্ঠ হয় না, দুঃখ-কষ্ট বুঝি সৃষ্টি করে না। ওদের মধ্যে কোন এ্যান্টি বডি। বরং সভ্যতার হাঁড়িকাঠে ওরাই হয় প্রথম বলি। যে খুনী সে নিজেই খুন হয় সবার আগে।

গুজব শোনা যাচ্ছিল, নওলকিশোর নূতন চাল দিয়েছে, লক্কাকে তার কোন কারবারে দায়িত্ব দিয়েছে ম্যানেজারির। অর্থাৎ ভদ্র ভাষায় লক্কা এখন হয়েছে পুরোপুরি পারচেজড, ক্রীতদাস⋯।

⋯লক্কাকে প্রথম কয়েকদিন খুঁজে পাওয়াই ভার। দেখা অবশেষে একভাবে মিলল। নওলকিশোর দিয়েছে ইতিমধ্যে আরেক অন্য চাল। লক্কাই শোনাল নূতন প্রস্তাব। ক্লাবের জন্য দু'কাঠা জমি নওলকিশোর ছেড়ে দেবে; ক্লাবকে পাঁচহাজার টাকা ডোনেশান-ও দেবে। পরিমাণ হয়তো আরো কিছু বাড়াতেও পারে। আর অঞ্চলের জল নিকাশের নালাটিকে সে মুক্ত করে দেবে। এ'ব্যাপারে তার প্রস্তাবটা অবশ্য নূতন নয়! কারণ নিজের

সাম্রাজ্যকে জলমুক্ত করার জন্য সে অন্যদিক দিয়ে নিকাশী জল-স্রোতকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এর ফলে একটা নূতন অঞ্চলে সহজেই জল জমে অন্য সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছিল। লঙ্কার মারফৎ নওলকিশোরের কূটচালের প্রস্তাবগুলো শুনে আমরা অবশ্য নিদ্বিধায় অসম্মতি জানিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ এখানেও আমাদের মধ্যে স্পষ্টবোধ নির্মলই ছিল, খুনীর পোষাক-আশাক, আভরণ বড় চতুরতাময়, মায়াবী হরিণ বড় কালান্তক।

লঙ্কার সঙ্গে ব্যর্থ আলোচনা সেরে আসার পর আমরা খুব সতর্ক হই। বুঝতে পারি নওলকিশোর এবার পেতেছে গভীর ফাঁদ। যে সততা, বিশ্বাস, আর আদর্শবোধের রাখীতে আমরা হাজার জনতা জমাট, ক্রুর ঘাতক সেখানে তুলেছে উদ্যত সর্বনাশা ছোরা।

লঙ্কার দল এদিকে ক্রমেই বেপরোয়া। সংলগ্ন অঞ্চলে সৃষ্টি করছে নিত্য নূতন উপদ্রব। সংঘের সদস্যদের যত্রতত্র যখন-তখন শাসাচ্ছে। বিপ্রকে দিয়েছে এমনকি চরম পরিণতির হুমকি। এক রকমে আমরা প্রায় তটস্থ।

স্থানীয় থানা-পুলিশ আগাগোড়াই ঘটনা সমূহ ওয়াকিবহাল। কিন্তু ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্যনীয় ওদের ভূমিকা, সার্কাসের খাঁচার মধ্যে ঝিমায় যেন নির্জীব পশুরাজ। কনসার্ট জোরে বাজাতে হয়। ট্রেনার মশাইকে চাবুক হাতে করতে হয় খুব লম্ফঝম্ফ। আলোকিত মঞ্চে এসে সিংহমশাই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তবে একটু আধটু খেলা দেখান। তড়িঘড়ি ভাব-সাবে বেশ স্পষ্ট, কত তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়তে হবে গারদ-বাক্সে। আছি তো বেশ নিজ ডেরায়। হে ঈশ্বর, এরা কারা? কেন হৈ রৈ করে? জানে না জগৎ মায়া। মায়া গো প্রপঞ্চ!....

একদিন শীতের সন্ধ্যা। ধোয়াশা ঘন পর্দা হয়ে নামছে অঞ্চলের ওপর! বিপ্র ক্লাবে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সারছে প্রায় একা

একা। আস্তে আস্তে আসবে হয়তো অনেকে। আচমকা ক্লাব চত্বরে অঝরে বোমাবৃষ্টি। কয়েকটা গুলিও এসে লাগল দেওয়ালে। পরে জানা গেল গুলির লক্ষ্য ছিল নিশ্চিত বিপ্র।

দ্বারস্থ হতে হল এরপর অবশ্যই প্রশাসনের উর্দ্ধতন মহলে। গোটা এলাকা জুড়ে চরম উত্তেজনা। লঙ্কার সঙ্গে এ'ভাবে মোকাবেলায় আমার, বিপ্রর আরো কয়েকজনের আপত্তি ছিল। আমরা প্রয়াস চালাচ্ছিলাম আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ও মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সচেতনতা ও শুভবোধকে সহজভাবে জয়যুক্ত করায়।....

কিন্তু কোন রোগীর আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিশাহারা আত্মজনকে হাতের কাছের অনভিজ্ঞ চিকিৎসকেরও বুঝি শরণাপন্ন হতে হয়। দুর্ঘটনার ক্ষেত্রে এ-ও এক দুর্ঘটনা। এছাড়া....।

লঙ্কাকে এ্যারেষ্ট করানো হল। অন্তত পরিস্থিতি আমাদের সে'রকমই বাধ্য করল। আড়ালে নিরাপদ রইল নওলকিশোর, তার গায়ে বিঁধল না একটাও কাঁটার খোঁচা। নওলকিশোরদের আশ্চর্য ভোজবাজি। এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে মজার খেলা।

লঙ্কা ভ্যানে উঠতে উঠতে সগর্জনে বলে গেল—শ্লা....বিপ্র, ঠিক আছে,—ফিরে এসে হবে শেষ বোঝাপড়া।....

(আঠারো)

সে'রকম কোন আঁচড়ই কিন্তু লাগল না নওলকিশোরের গায়ে, বরং অন্যভাবে বলতে গেলে অবস্থান্তরে তার পালেই বইতে লাগল সু-হাওয়া।

লঙ্কার বিরুদ্ধে কতকগুলো সুস্পষ্ট অভিযোগ ছিল ; এ'ছাড়া এ'সব ক্ষেত্রে সচরাচর যা হয়, পুলিশের ব্ল্যাকলিষ্টে থাকা লঙ্কার বিরুদ্ধে এতদিন অনেক অনেক নাকি অভিযোগ তোলাই ছিল, সেফ ডিপোজিট লকার থেকে নামিয়ে আনা সে'সব গহনায় নগর

কোটালরা এখন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন হঠাৎ লঙ্কাকে সুসজ্জিত করতে।

মামলা চলাকালে শোনা গেল একটা কান-কথা, হাড়-বজ্জাত নওলকিশোর তরী বেঁধেছে আরো শক্ত খুঁটিতে। হাত গুটিয়ে নিয়েছে তাই লঙ্কা থেকে।....হায় লঙ্কা, বেচারা....!

বিপদ তাই আরো ঘনীভূত। নূতন তূণ, তূণীরে নওলকিশোর এখন বড় উজ্জীবিত। দিনে দিনে বড় বে-পরোয়া। তার পাত্র-মিত্র এখন নিতান্ত ভদ্রজন, তথাকথিত মণিময়তায় ভূষিত, আসীন সমাজ-সভ্যতার উপরিতলেও। ওরা রহস্যজনকভাবেই এসে মিশে যায় নওলকিশোরে। প্রথমে মাখামাখি; পরে নওলকিশোরে অঙ্গীভূত, —বিলীন। লড়াইয়ে তাই ভিন্নতর ব্যঞ্জনা বাজে।

অনেক কিছুই নূতন হয়। পরিবর্তিত। হাল-হকিকত দেখে মনে ধন্ধ লাগে, চোখ দুটো পুরোনো আছে কি অথবা বুঝি নূতন হয়। আমি-বিপ্র-আমরা মাঝে মাঝে চোখ ঘষি, যা দেখছি সব ঠিক দেখছি তো! দৃষ্টিশক্তিতে....!

নওলকিশোর গুপ্তা বনে গেছেন '....'। তিনি এখন অনেক কিছু; সামনে-পেছনে তার এনে বসাতে হয় অনেক শব্দ, বিশেষণ, বর্ণমালা। হে অভিধান, তুমি কত উজাড়, সহজেই নিঃশেষ কর মানুষের কত ধ্যান-বিশ্বাসের, আলোকের, হৃদয়ের সম্পদমালা, মাঝে মাঝে কত সহজেই!

কি দোষ অভিধানের? শব্দের? জয়নাদের? শুধু শব্দ, সজ্জিত ভাষা, আশ্চর্য বাক্যমালার মায়াবী চাতুরিতে মানুষ পৃথিবীতে খেলায় কত না বাজির খেলা! রাত দিন হয়, নওলকিশোর জনসেবক, গণনেতা, প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক! তার বিচরণের জগৎ বিঘোষিত হয় আশ্চর্য গরিমার সম্মানে। শল্যে জুটে আসা শকুন, গৃধ্র-গৃধিনী মহিমান্বিত হয় মানুষের মর্যাদায়! হে ভাষা, কোন বেড়িতে তুমি বন্দী হও ক্রীতদাস! স্বর্ণ শৃঙ্খলও কি এ'ভাবে মাখে কোন শ্লাঘা?

প্রায় অন্য গ্রহ থেকে অবতীর্ণ কিছু বাগ্মী মানুষ নিয়ে নওলকিশোরবাবু একদিন তার নয়া সাম্রাজ্যের আঙিনায় এক জনসভা করলেন। অঞ্চলের তাতে প্রায় কেউ ছিল না। সে সভার উপলক্ষ কি, প্রাসঙ্গিকতা কি, এহ বাহ্য। উদ্দেশ্য তো জলের মতো ফর্সাই। তার বিরুদ্ধে যারা, তাদের বুঝিয়ে দিতে তিনি এখন খুব তীক্ষ্ণ, যেন হাঁক দেন,—দ্বৈরথে এসো সমবেত জনতা, আমার পক্ষেও আছে পক্ষহীন সভ্যতা,....আছে....।

কে একজন একদিন বললেন, জানেন নওলকিশোর খুব সন্দেশ খেতে ও খাওয়াতে ভালবাসে। ওর সভায় যারা জুটেছিল তাদের জুটেছে পেট পুরে সন্দেশ খাওয়া। এই সন্দেশ 'আহরণকারী পড়শীই পরমুহূর্তে নিজেই বিস্ময় প্রকাশ করলেন,—অন্য খাদ্য-পানীয় নয়, সন্দেশ-প্রীতি, ব্যাপারটা কি বলেন, খুব মজাদার নয়?....

সেদিন কিছু সামান্য বর্ষণে আমাদের এলাকার কিছু অংশ ছিল জল মগ্ন। প্রভাতী সংঘের সদস্য আমরা গিয়েছিলাম জলময় সে দুর্দশাগ্রস্ত অঞ্চলগুলো সরেজমিনে দেখতে। পথে আসতে আসতেই শুনলাম, নওলকিশোরবাবুর সভাপর্বের তামাম বৃত্তান্ত, সন্দেশ-সভার সন্দেশও হল কর্ণগোচর।

আচমকা মনে পড়ে গেল, পুরোনো কলকাতার তথাকথিত অভিজাত গরিমার এক অনন্য ঘটনার কথা। দেড়'শ বছর আগের কলকাতায় বসত সন্দেশের মজলিস। আকাশ বুঝি রিম-ঝিম। পথ-ঘাটে বুঝি থৈ থৈ জল। কলকাতার ধনী অভিজাত জনের মনটা বুঝি একটু কিরকম কিরকম! মাহ ভাদরে বসে যেত নানা আনন্দের হাট। তার একটা ঐ সন্দেশের মজলিস।

একটা বড় হলঘরের মেঝে জুড়ে প্রায় একফুট উঁচু করে কড়া-পাকের সন্দেশ দিয়ে একটা বেদী তৈরী করা হত। তার ওপর সুদৃশ্য

কার্পেট পেতে গানের আসর বসানো হত। শোনা যায়, সন্দেশের পরিমান দাঁড়াত দুই থেকে চার মণ। চারপাশে সুগন্ধী ধূপ পুড়তো আর মাঝখানে আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে বসে সুন্দরী বাঈজীর গানের মধুর সুরের মূর্চ্ছনায় ও সন্দেশের মিষ্টি গন্ধে বিভোর হয়ে যেত সেকালের শহর কলকাতার বাবুরা। সাধারণত পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলেই এ'রকম সন্দেশের আসর আয়োজিত হত বেশী।

....নওলকিশোরের সন্দেশ-সভা মুহূর্তে পেয়ে যায় অন্য ব্যঞ্জনা। আমি চিন্তা করতে থাকি। সভ্যতার খড়-বিচালি জড়ানো কাঠামোটা কতটুকু বদলেছে? কিছুই বুঝি বদলায় নি। শুধু বদল গাত্র-প্রলেপ, আবরণীর, প্রসাধনীর। বদলেছে খলিফা-ঘরের ঠিকানা। রঙরেজ, ওস্তাগরের আশ্চর্য নিপুণতা। বর্ণাঢ্য পোষাকের নীচে যে শরীর উদোম, নিরাবরণ,—সে হাড়-মজ্জায় সময় কি রাখতে পেরেছে কোন অনিন্দ্য অতল স্পর্শ!

হে সময়। কোন এক অফুরাণ সমুদ্র-ভাণ্ডার থেকে তুমি চির-সঞ্চারমান প্রতি অনু পলে তুলে আনো,—বুঝি গভীর অতল থেকে আনছ সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, প্রহর, দিন, মাস, বছর, পৃথিবীর অগ্রগতি। মানুষের জয়যাত্রা। প্রতি ক্ষণে ক্ষণে তোমার বদলায় অনন্য সম্পদ আহরণ। এ' মুহূর্তে যা পাও তা মূল্যবান; পর মুহূর্তে তা মূল্যহীন। আরো অমূল্য তুলে আনতে হবে গুপ্তধন। বদল চাই বদল, তামাম যা কিছু, তার ঘটাতে হবে আরো শ্রীবৃদ্ধি, উন্নতি, সমৃদ্ধি। তুমি টেনে তুলছ পৃথিবীকে সুপ্ত খনি-সমুদ্র থেকে আরো উঁচুতে—অনেক ওপরে—বিরাট শীর্ষে। কিন্তু....।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পাই স্নিগ্ধার ডাকে। স্নিগ্ধা বলে ওঠে,—বড়দা, কি হলো, চলুন, জলে ডোবা মানুষগুলোর সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে পিটিশানটা ড্রাফট করে দেবেন। আমি এ'বেলায়-ই টাইপ করে আনব।....

আমি নিজের মধ্যে দ্রুততা এনে বলি—হ্যাঁ, হ্যাঁ, চলো, চলো.... ।

(উনিশ)

স্নিগ্ধার ডাক নাম জয়া

গোটা মহল্লা বেড়ে সে কত ফুল-ফলের গাছ লাগিয়েছে। সে'সব গাছে গাছে ঋতুতে ঋতুতে ফুল বদলায়, জানা-অজানা কত পাখী ডাকে, গাছ-গাছালির নীচে রোদ-ছায়ার আল্পনা ; বাতাস সে আল্পনার ওপর দিয়ে দেবী প্রতিমার মতো মিষ্টি পা ফেলে ফেলে হাঁটে—ঝিরঝির--তিরতির—প্রশান্তিময়। এক স্নিগ্ধতা মুছিয়ে দিয়ে যায় কত রুক্ষতা—অনেক রুক্ষতা।

স্নিগ্ধা প্রভাতী সংঘের শিশু বিভাগের পরিচালিকা। একদিন সে এক সভায় বলেছিল,—দশানন এক দৈত্য মুখ ব্যাদান করে আমাদের গ্রাস করতে আসছে, এগিয়ে আসছে দূষণ ; আমাদের কড়মড়িয়ে খাবে, তিলে তিলে খাবে, রসিয়ে বসিয়ে খাবে। এসো মানুষ, অমৃতের সন্তান, চেনো গাছপালা। ওগুলো হাতিয়ার, সে হাতিয়ার দানব আর তোমার মাঝখানে উচানো ধরা থাক। দানবের লুব্ধক গ্রাস কিভাবে তোমার কেশাগ্র ছোঁবে ? পৃথিবীতে আরো নানা কিসিমতের দৈত্য-দানো, ভূত-পেত্নি আছে। আছে দানবাদি-দানব-ও। তাদের সঙ্গে, হ্যাঁ, তোমাদের নিশ্চয়ই পরিচয় ঘটবে। তবে একেক জনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কৌশল-কায়দা কিন্তু আলাদা। আমরা সবশেষে দাঁড়াবো এক সীমানায়—এক প্রান্তরের এ'পাশে মানুষ—ওপারে মহাদানব। সেদিন সর্বত্র চূড়ান্ত ফয়সালা। কে থাকবে ? —ফুল্লমান মানুষ অথবা মহাভৈরব মৃত্যু বা অন্ধকার ?....

স্নিগ্ধা বা জয়া আমাব ছাত্রীপ্রতিম। অঞ্চলের সকলের খুব প্রিয়। ওর আরেকটা পরিচয় আছে, ও বিপ্রব বাগদত্তা।

দু'জনে মিলেছে সুন্দর জুটি। বিপ্রর কথা আগে কিছু বলেছি। নূতন করে বুঝি কিছু বলার নেই। কিন্তু সত্যি কি তাই? এত সহজে এখানে ইতি নামানো যায়! বিপ্র মানে যে আসলে আমরাই। সমবেত আমাদেরকে নিয়েই বুঝি যা কিছু তা বিপ্র। আমাদের যন্ত্রনা, আমাদের যে অন্তর্জালা, আমাদের অস্তিত্বের পিঠে কোথাও সপাং সপাং চাবুকের শব্দ, আমাদের রক্তাক্ত হওয়া, বেদনায় মুচড়ে মুচড়ে যাওয়া, তারপর এ'সবের থেকে দ্রিমিদ্রিমি তালে রক্তপলাশের জেগে ওঠা, আমাদের সাহস, আমাদের স্বপ্ন, স্বপ্নকে ছুঁয়ে ফেলা, প্রায় ছুঁয়ে দিতে পারা, পারব আমরা, হ্যাঁ আমরা পারব—তার নামই বুঝি বিপ্র। হ্যাঁ, আমরা জাগছি, অহল্যা মাটি চোখ মেলছে। ভরবে পৃথিবী সবুজে, বিশ্বভুবন প্রযত উঠান, সেখানে অশ্রুর ক্লেদাক্ত পদচিহ্ন এতটুকু নেই—আমাদের রোদময় সে সত্তায় বিম্বিত, অঙ্গীভূত, কর্মময় যা কিছু, তার জীবন্ত নাম বিপ্র। স্নিগ্ধা বা জয়া আছে তার পরিপূরকে—পাশে পাশে।

যে মেয়েটি এখান-সেখান থেকে খুঁজে-পেতে নানা গাছ-গাছালি এনে আশ্চর্য মমতায় এ' মহল্লার আনাচে-কানাচে পুঁতে দেয়; বস্তী মতো অঞ্চলের শীর্ণ-দীর্ণ শিশুদের জুটিয়ে এনে প্রভাতী সংঘের কক্ষের চাটাইয়ের উপর বসিয়ে শেখাতে চেষ্টা করে,—ওরে, আমরা সবাই মানুষ, মানুষের মতোই আমাদের বাঁচতে হবে;—অঞ্চলের যে সমস্ত মেয়েরা জীবনে বসন্ত কি কোনদিন জানে নি, হয়তো জানবেও না কোনদিন, যারা গরু-মোষের কেনা বেচার মতো পৃথিবীতে যে অন্য এক হাট আছে, যেখানে ক্রেতার মন ভজাতে হয় দামী, বড় দামী মণি-কাঞ্চনে, বিত্তে-ধনে, আশ্চর্য ধনময় ধ্বনিতে, ওদের জীবনে সে'সব সব যে দূর গগণের তারা, ঘোর অমাবস্যাব অতলো তলিয়ে গেছে ওরা অবলুপ্ত জ্যোৎস্না, মরে যাওয়া চাঁদ,—স্নিগ্ধা—জয়া, আমাদের সত্তার ফোঁটা এক আশ্চর্য রক্তকরবী তবু ভিন্ন কথা বলে, এখানে ভিন্ন গান

শোনায়, জ্বালায় আশ্চর্য আলোকশিখা—ঐ মেয়েদের নিয়ে গড়েছে হাতের নানা কাজ শিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র;—সেটির পরিচালিকা সে।

এক অনন্য ঘটনায় স্নিগ্ধা আমাকে একদিন আশ্চর্য করে দিয়েছিল;—বিপ্রকে লক্ষ্য করে যেদিন লক্কা গুলি চালিয়েছিল, সেদিন স্নিগ্ধার চোখে আমি বুঝি দেখেছিলাম এমন এক জমাট আগুন যা পৃথিবীতে ফেটে পড়লে, তার দারুন গ্রাসে পৃথিবী এক পলকে পুড়ে ছাই হয়ে যেতে পারে—ছারখার হয়ে যাবে সব কিছু।

এই স্নিগ্ধাকেই দেখেছিলাম বুঝি এক পাষাণ প্রতিমা। যেদিন সে শুনল, শয়তান নওলকিশোর পরিস্কার অস্বীকার করেছে লক্কার সঙ্গে ওর কোন সম্বন্ধ নেই, লক্কার সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে সে ঝাড়া হাত-পা সাজতে চেয়েছে, লক্কাকে পথে বসিয়েছে, নানাভাবে এক সময় মদত দিয়ে এখন ওকে সশব্দে লাথি মেরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে সর্বনাশের ঘোর পঙ্কে,—সে'দিন স্নিগ্ধা এ' কথা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে চায় নি। ওর চোখ দিয়ে নেমে এসেছিল অশ্রুর ঢল। আমি অবাক হয়ে দেখেছিলাম স্নিগ্ধাকে—জয়াকে। ওর মুখ বুঝি দেবী প্রতিমার মুখে জড়ানো অপরূপতাময় কোন উপত্যকা, বয়ে চলেছে সেখানে করুণা মন্দাকিনী সুরধনী।

বস্তীর মতো যে অঞ্চলটায় লক্কা বাস করে, এরপর থেকে লক্ষ্য করেছিলাম সে অঞ্চলের উন্নয়নের চিন্তা বুঝি তার জীবনের ব্রত হয়েছে, হয়েছে ধ্যান-জ্ঞান।

এ'রকম সময়েই একটা দামী কথা বলেছিল স্নিগ্ধা,—ঐ সেদিন, যেদিন আমরা, লক্কারা যেদিকে থাকে প্রায় জলের তলায় তলিয়ে যাওয়া সে অঞ্চলটা ঘুরে-ফিরে মানুষ-জনের চরম দুঃখ-দুর্দশা দেখে এসে তার প্রতিকারের কথা নিয়ে আলাপ-আলোচনা করছিলাম, স্নিগ্ধা আলোচনার মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী ব্যবস্থা প্রসঙ্গে জোর দিয়ে বলেছিল—

কেন সবাই জলের তলায় সে কথাটা গুরুত্ব দিয়ে সবাইকে বোঝাতেই হবে, সেটা খুব দরকার, জরুরী। সবাই এক কারাগারে আছি, জল সবাইকে বেঁধেছে শেকলে, কিভাবে এবং কেন, সে কথাই ফর্সা করে জানাতে হবে আগে সকলকে। সব যখন এক সময় স্বচ্ছ, মানুষ দাঁড়াবে মুখোমুখি, দাঁড়াবে হাজার জনতা, অযুত পদাতিক, বিরাট অক্ষৌহিনী—সজলতা ছিঁড়ে ফেলতে এক বীতশোক সভ্যতা যে কত কেঁদেছে,—কতকাল,—কতভাবে; কান্না জমাট বেঁধে বেঁধে যার মাথা তোলে হিমালয়, অশ্রুর তরল নদী মিলিয়ে মিলিয়ে যার পৃথিবীতে বয়ে চলে সপ্তসিন্ধু .. ।

স্নিগ্ধা কি সেদিন আমার বুক থেকে এতকাল আমারই না-বলা-বাণীর কথাগুলোকেই তুলে নিয়ে গিয়েছিল ? ও কথা যে আমারই। শুধু আমার ? না শুধু আমার কেন ? অনেকের —বুঝি সকলের।

ভেতরে ভেতরে কে যেন এ' রকম একটা কথা এ-সময় হঠাৎ বলে ওঠে, বলে যায় —স্নিগ্ধা আমাদেরই নাম, আমাদের নামই তো জয়া।

(কুড়ি)

'ঈশানে উড়িল মেঘ সঘনে চিকুর.... ।' সাল ১৯১৩।

ঘর পোড়া আমি, সিঁদুরে মেঘ দেখলে ডরাই। কিন্তু এবার ভয় পাওয়া বা আশঙ্কিত হওয়া বুঝি মোটেই অহেতুক বা অমূলক ছিল না।

বন্যা এবার স্পষ্টভাষ। বর্ধমান, মেদিনীপুর, হাওড়া, হুগলী এমন কি বাঁকুড়া, বীরভূমেও কয়েকদিন ধরে চলেছে অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ডি, ভি, সি, অস্তিত্ব টেকাতে দিশাহারা। খবরের কাগজের খবর আবার ভয়ঙ্করতামাখা কালো অক্ষর, শব্দের ও বাক্যের মিছিল। দিক-দিগন্ত নিয়ে উত্তরবঙ্গ তলিয়ে যাচ্ছে জলের তলায়। ডুবছে দক্ষিণবঙ্গ।

কয়েকদিন স্বাভাবিক বা মাঝে মধ্যে একটু-আধটু ভারী বর্ষণ হলেও, প্রকৃতি আবার সেই গানের মতো, 'মেঘের কোলে রোদ উঠেছে, বাদল গেছে টুটি....।' কিন্তু ২১ সেপ্টেম্বর শেষ রাত থেকে আকাশে স্পষ্ট ভাসল অন্য রূপান্তর। কালো এক সমুদ্র সগর্জনে ধেয়ে আসছে পৃথিবীর দিকে। মধ্যরাতে রেডিওর খবরের কণ্ঠস্বর বড় গম্ভীর—বঙ্গোপসাগরে কেন্দ্রীভূত হয়েছে এক দারুন নিম্নচাপ—ছুটে আসছে....।

যদিও আপাত দৃষ্টিতে এ' খবরে আশঙ্কাকর হয়তো বিশেষ কিছু ছিল না। কিন্তু গগণে অব ঘন/মেহ দারুন/সঘনে দামিনী চমকই/ কুলিশ পাতন/শব্দ ঝন ঝন/পবন খরতর বলগই ॥' বিনিদ্র রাতে আমার কেবল মনে হয়—'আজু দুরদিন ভেল।'

একদিকে বর্ষা মরশুমের ফলে চারদিক জলে টইটম্বুর হয়ে রয়েছে। জল নিষ্কাসনের তো সব পথ প্রায় বন্ধ। জোরালো রোদ কই যে জল বাষ্প হবে? বরং আকাশের প্রত্যন্ত সীমানার বাঁধ আবার যে ভাঙে। সারারাত জেগে আকাশ-পাতাল কত কিছু চিন্তা করি। ঠিক যেন রিণির মৃত্যুর দিনের মতো, সেদিন-ও তো আকাশ এমনি, বাতাস হু হু, এলোমেলো; আকাশ ঘন ঘন বাজায় প্রলয়-বিষাণ। এক সময়....। সব কিছু স্পষ্ট মনে পড়ে যায়। কোথায় যেন উধাও হয়েছিল এক স্মৃতি; এ' মুহূর্তে কে আবার সামনে এসে দাঁড়ায় কত চেনা, বড় অবিকল, কত জীবন্ত। নিশুতি রাত, গা ছমছম করে দিয়ে হেঁটে চলে প্রহর। স্পষ্ট শুনতে পাই রিণিকে,—ওর আর্তনাদ—ধারালো অস্ত্রের মুখে রাত কেটে, কত হারানো লুপ্ত বছরের জমাট ধূসরতা কেটে সে এগিয়ে এসে আমার সামনে উপস্থিত, একদম সজীব। হ্যাঁ ঐ তো স্পষ্ট দেখি রিণি আমার বুক ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে—আমার বুকের মধ্যে;—সে কথা বলে চলেছে,—বলছে বাপি, জল.....আবার জল....।

খুব ভয় পেয়ে যাই। শিউরে উঠি। রোমকূপে শিহরণ কেঁপে চলে। মেঘের আড়ালে লুকিয়ে আছে যেন কে? কে নামছে এই রাতে, ছত্রীসেনার মতো কারা দুদ্দাড় পৃথিবীতে নামছে? মানুষকে আবার ঘিরে ধরে ধীরে ধীরে গুটিয়ে আসছে এক কালান্তক মৃগয়া। কোথায় পালাবে মানুষ? কোথা দিয়ে কে পালাবে? বেরোনোর সব পথগুলোতে শেকল তোলা, ভয়ঙ্কর দেওয়াল। জল অনায়াসে শেকল পড়িয়ে চলেছে,—বেড়ি। এবার চলো শৃঙ্খলিত-বন্দী সভ্যতা, —মানুষ, ঐ দেখা যায় বধ্যভূমি। আর দূর নয়, বেশি দূরে নয়।....

২২ তারিখ দিন ফোঁটার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে তাকাই। চারিদিকে জল আর জল। কিন্তু একী, কোথায় গেছে গত রাতের মেঘের, আকাশের করাল ষড়যন্ত্র? বৃষ্টি ধরেছে, মেঘের আড়াল থেকে এমনকি ভেসে আসছে রুপালী রোদের মহাবন্যা! মনের ভেতর কেমন কেমন করে। গত রাতে আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল যে, যে স্মৃতি, তা কি তবে মিথ্যা? মিথ্যা এমন কী রিণির সতর্কীকরণের কণ্ঠস্বর?....

বিপ্র, স্নিগ্ধা, প্রভাতী সংঘ তথা পল্লী উন্নয়ন সমিতির অনেকে ইতিমধ্যে এসে যায়। আসছে আরো অনেকে। খুব সাংঘাতিক খবরাখবর না নিয়ে এলেও সকলের সমবেত সংবাদচিত্রের যোগফল কিন্তু খুব স্বস্তিদায়ক নয়। গুরুত্ব দিয়ে আমরা আলোচনায় বসি, আবার যদি বর্ষণ নামে, জল বাড়ে সে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অবলম্বন করা উচিত কি কি ব্যবস্থা নেওয়া? মুখে ভেঙে না বললেও প্রধানত গত রাতের স্মৃতির প্রভাবে আমি বেশি উদ্যোগ দেখাই, —নানা জায়গা থেকে বন্যা-প্লাবনের বড় খারাপ খবর আসছে। এখানে আমাদের সতর্ক থাকার খুব দরকার....

২২ সেপ্টেম্বরের বিকেল। সূর্য যেন আজ পৃথিবীরও পর বেশি রোদ ঢেলে দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কোন্ দূর প্রত্যন্ত থেকে ভেসে

আসছে যে হাওয়া তা সাপের গায়ের মতো ঠাণ্ডা। নিশ্চিত অন্য কোথাও খুব বৃষ্টি হচ্ছে—ভারী বর্ষণ। বড় উজ্জ্বল রোদ তারপর একসময় ঝপ্‌ করে নিভে যায়; সে' মুহূর্তেই হানা দিয়ে এগিয়ে আসে গাঢ় অন্ধকার। কেন যেন মনে হলো—মনে হল আচমকাই—প্রদীপ নেভার আগে উজ্জ্বল হওয়ার মতো মরল কি দিন! নিভলো আলো, প্রবহতা স্বস্তি, সুখ?....

রিণি আমার মা-মণি। আমার কাছে কোনদিন কোন মিথ্যে বলে নি। তার মৃত্যুর পর বন্যা সম্বন্ধে আমার সতর্কতা, পর্যবেক্ষণী-ও মিথ্যা হতে পারে না,—হওয়ার নয়। ২২ তারিখ রাত এক দেড় প্রহর কাটতে না কাটতেই আকাশ আবার পূর্ব রাতের মতো ভয়াবহ,—বরং আজ যেন তার ভাবগতিক স্পষ্ট বে-পরোয়া। জোরালো প্রস্তুতি নিয়ে এসেছে বুঝি হানাদার দুর্বৃত্ত বাহিনী, আজ যেন কারো কোন কসুর নেই, মাপ নেই, আজ চরম ফয়সালা এসপার-ওসপার। তলিয়ে দিতে হবেই আজ রাতে জনপদ-ঘাঁটি।

রাত দুটো। বাইরে বইছে মহাপ্রলয়, জল-বাতাস-বজ্রের কি উন্মত্ত মিতালি! সাংঘাতিক নির্ঘোষ! কে কাকে ডাকবে? কোথায় যাওয়া? বাইরে বেরোনো কার সাধ্য? দু' একবার দরজা খুলি, বারান্দায় এসে দাঁড়াই। এদিক-সেদিকে তাকাই। বর্ষণ এত অসারে যে চারদিকে পুরু কুয়াশা, পৃথিবীর ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছে কে যেন এক ঘন আস্তরণ। ঐ আব্রুর নীচে কোথায় যে কি ঘটে যায় তা বোঝা অসাধ্য। বেশিক্ষণ বারান্দায়-ও বুঝি দাঁড়িয়ে থাকা অসম্ভব। দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না। বাতাস ঝাপট মারে, দামাল বাতাস সুস্থিরে দাঁড়িয়ে দেখতে দেবে না। বুঝি কি কুকর্ম সংঘটিত করে চলেছে আজ প্রকৃতি এ'রাতে, এ'মুহূর্তে, প্রত্যক্ষ করতে দিতে তার প্রবল আপত্তি। মুহুর্মুহু আকাশে ভাসছে গোলা-ফাটানো আওয়াজ।

কি সাংঘাতিক বিস্ফোরণের ভয়াল শব্দরাজি! ঝলসে উঠছে ঘন ঘন শান দেওয়া ছুরি, কৃপাণ, হাঁসুয়া, খড়্গ কি তরবারি। অবাধ হত্যা-যজ্ঞ, খুনে-লুটেরা আজ মানুষকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে....।

কোথাও কোন কোলাহল জাগছে কি না কান খাঁড়া করে শুনতে চেষ্টা করি। হঠাৎ কোথায় একটা প্রচণ্ড আলোর ঝলক। নিমেষে সব আলো নিভে যায়। কি শিউরে-ওঠা অন্ধকার! বৃষ্টি যেন আরো ঝেঁপে নামে। কানে তালা ধরে আসে; বুঝি জগৎ-চরাচর লুপ্ত।

দরজা বন্ধ করে ঘরে আসি। দীপা দ্রুত একটা লণ্ঠন জ্বালায়। ওর মুখ-চোখ বড় গম্ভীর। স্পষ্ট বোঝা যায়, সাংঘাতিক এক আতঙ্ক, ভয়ঙ্কর এক উদ্বেগ ওর মনকে গেঁথে ফেলেছে। বড় নির্বাক দীপা।

চুপচাপ তু'জনে পাশাপাশি বসে থাকি। ভয় বুঝি অক্টোপাশের মতো আমাকেও বাঁধতে চলেছে! সকালবেলায় খবরের কাগজে বন্যার বিধ্বংসিতার যে খবরগুলো পড়েছিলাম, মালদহে ফুলহার নদীর করাল গ্রাসে কত গ্রাম চলে গেছে জলের তলায়, ফারাক্কায় গঙ্গা ভয়ংকর ফুঁসছে, মেদিনীপুরে হাজার হাজার গ্রাম নিমজ্জমান, আরামবাগ, নবদ্বীপ, হাওড়া, হুগলীর কত জায়গায় একতলা, দেড়তলা বাড়িও নাকি জলের তলায় ডুবে গেছে, মানুষ ভেসে যাচ্ছে, গবাদি পশু ভেসে যাচ্ছে, ঘরের চালা ভেসে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে ঘর-বাড়ি, রাস্তা-ঘাট বিধ্বস্ত; ফসলের ক্ষেত, গ্রাম-জনপদ উজাড়, গাছে চড়ে বসে আছে মানুষ, মানুষের পাশে এমন কি বিষধর সাপ, কেউ উঁচু কোন ছাদে উঠেছে, কোন উঁচু জায়গায়; খাদ্য নেই, পানীয় নেই, জল—সর্বত্র অসীম, অনন্ত, তবু তা মুখে দেওয়ার অযোগ্য। ভাসছে পৃথিবী মহাসমুদ্র, নিঃসীম জলরাশি—করাল, ভয়ঙ্কর, সর্বনাশী। বিদ্রোহ—মহাবিদ্রোহ

আজ দিকে দিকে, রঙ্গিল থেকে মাতলা, চুর্ণী থেকে সুবর্ণরেখা আজ ক্ষেপেছে দিক দিগন্তে হাজার নাগিনী।....

মায়ের কোল থেকে তলিয়ে গেছে শিশু, পিতা কাঁদছেন সন্তানহীন, সিঁথির সিঁদুর মুছে গেছে স্ত্রীর, স্বামীর বুক জুড়ে উত্তাল হাহাকার—সর্বত্র, প্রায় সকলকে ছুঁয়ে চলেছে মৃত্যু, কোথাও সে চরম ঝাপটে হেনেছে ঘোর সর্ব্বনাশ, কোথাও ঝাপটে তার নামে নি মৃত্যু-শেল, তবে যা এসেছে তাতে মৃত্যু-ও বুঝি হার মানে, মৃত্যু-শোকও স্তব্ধ হয়, লজ্জা পায়। প্রচণ্ড বাষ্পে বুঁজে আসে চোখ, জলময় মাটির ওপর থেকে উঠছে কান্নার বাষ্প, বাষ্পাকুল আর্তনাদ। শশ্মান-কাঁপানো হাহাকার, বড় মর্মন্তুদ—বুক খান খান— হৃদয় চৌচির।

হঠাৎ দীপা সাংঘাতিক আর্তনাদে চিৎকার করে ওঠে—প্রচণ্ড ভয়ার্ত আওয়াজ,—দেখ,—দেখ, ঘরে জল ঢুকছে....। জোরালো টর্চের আলো ফেলি, পাটল রঙের জল লকলক করছে খড়িস বা ভয়ানক কালসাপের মতো। দ্রুত গিয়ে দরজা খুলি। এক মাতাল দুর্বৃত্ত যেন চৌকাঠে দাঁড়িয়ে উন্মত্ত হয়ে টলছে; তার উপস্থিতিতে ভেসে উঠছে চরম হিংস্রতা—আদিমতা—বুনো প্রাগৈতিহাসিকতা। মূর্তিমান সে বর্বরতা খলবল আওয়াজে আমার সঙ্গে রূঢ় কথা বলে— আদেশ দেয়,—পথ ছাড়ো, ছেড়ে দাও........।

ঠিক রিণির মৃত্যুর সময়কার অভিজ্ঞতা। প্রথমে জল পায়ের পাতায় সড়সড় করে, তারপর সে উঠছে, ...ভয়ঙ্করভাবে উর্দ্ধচারী। রাত যখন চারটে, আকাশে বুঝি কাকজ্যোৎস্না, জল ছুঁয়েছে জানু। ঘরের মধ্যে চারদিক তছ্‌নছ্‌। অনেকক্ষণ অনেকভাবে অপ্রতিরোধ্য তার সঙ্গে যুঝেছি আমরা, সব শেষে বিধ্বস্ত। যখন কালিমা মেখে ধীরে ধীরে উদীয়মান ভোর, জল উঠে এসে শুয়েছে পালঙ্কে। সেখানে-ও প্রায় হাঁটু ডোবানো জল। খাটের ওপর তুলে দিয়েছিলাম

একটা তক্তপোষ। দীপা ও আমি সেখানে নিয়েছি এক দুঃসহ আশ্রয়। অপেক্ষায় রয়েছি স্পষ্ট আলো ফুঁটুক,....জানি না সে কোন্ ভোর ? কি তার রঙ ?....তারপর.... ।

....একসময় হঠাৎ বাইরে কোলাহল শোনা যায়। হ্যাঁ, ঐ তো এসেছে ওরা, এসেছে বিপ্র, তমাল, সুজিৎ, দিবাকর আরো অনেকে। ওরা ডাকছে। নিজেকে কিছুটা ছোট মনে হয়। ভেতরে একটা শিণশিণ লজ্জা। দু'দিন আগে আমিই বন্যার মোকাবেলায় কত রণকৌশলের ছক কষিয়েছিলাম, জল লাফিয়ে উঠলে কিভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে—দাঁড়াতে হবে ওর মধ্যে টানটান হয়ে—তৎপরতা চালাতে হবে, কারো জান-মান যেন না বেঁকে—না টলে—না ভাঙে, কিন্তু.... ।

বিপ্ররা কোত্থেকে একটা নৌকা জুটিয়ে এনেছে। আমার বাড়ির সদর দুয়ারে নৌকা। এক গলা জল ভেঙে কে যেন এগিয়ে এলো ! মুহূর্ত সময়েই সে যে বর্ণনা শোনালো, এককথায় বুঝলাম তা ভয়াবহ। আরো অনেক কথা সে দ্রুত বলে গেল। শোনালো অসাধ্য সাধনেরও কথা—প্রশাসনিক মহলে যোগাযোগ করা হয়েছে। তারা নামছে উদ্ধারের কাজে। বিপ্ররা এরমধ্যে কোথা থেকে দু'টো নৌকা জুটিয়ে এনেছে। জলবন্দী মানুষকে নিয়ে তোলা হচ্ছে স্থানীয় কলেজে।

আমি দীপাও নৌকায় উঠলাম। প্রায় বাড়ির দরজা থেকে নৌকা ছাড়ল। বুঝি বুক আমার পলকা, ভেঙে পড়বে, গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে, খান খান। চোখ আমার ছিঁড়ে আসছে, কান্না বুঝি বন্দিনী, চোখের আবরণের ওপর সে আছড়ে পড়ে আঘাত করছে —লোহার গরাদের শিকের ওপর মাথা ঠুকে কেঁদে চলেছে আলুথালু বেশ এক এলোকেশী। চোখের ওপর চামড়ার আস্তরণ যদি না থাকত,

পরিপার্শ্ব জলময়তায় আরেক অশ্রুর নদী ঝরে গিয়ে মিলতো। হায় জল, দু'দিন আগেও যেখানে মাটি, ডাঙা, জনপদ, বাড়িঘর, রাস্তা, প্রান্তর আজ তার ওপর কায়েম তোর কি রূঢ় সাম্রাজ্য ! কি ভয়ঙ্কর, বিভৎস।....ছপ্‌ছপ করে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলে নৌকা। অনেককে তুলে নিতে হয়। আশ্বাস দিয়ে যেতে হয়—আসছি, আসব, আসছি। চেয়ে থাকতে আর ইচ্ছে করে না, কি দেখছি চারদিকে—এ' সব কি দেখছি! আকাশ তুমি কি অনেক উঁচু, আমাদের কান্না বুঝি তোমার পায়ে লুটিয়ে গিয়ে মাথা কুটে কাঁদতে পারে না !....

ধূসর—ক্রমশ ধূসর হয়ে আসে সবকিছু। চারদিকে সব ঝাপসা —সব হারিয়ে যাওয়া। সব মায়াডোর বুঝি বৃন্ত-ছেঁড়া,—চেনা যা কিছু, যা কিছু প্রতিদিনে জড়ানো-মাখানো, আশ্লিষ্ট ঘর-গেরস্থালি, অস্তিত্বের শিকড়, নাভিমূল, ডাল-পালা সব—সব আজ দূর—বহুদূর— ক্রমশ বিলীয়মান, হারিয়ে যায় ধূ ধূ শূন্যতায়। মূক ব্যথা খুব ভারী। আর সুস্থির থাকে না, টুপটুপ ঝরে। চোখ অবশেষে নির্বাধ হয়।

বাঁধিলাম ঘর এই শ্যামা আর খঞ্জনার দেশ ভালোবেসে
ভাসানের গান শুনে কতবার ঘর আর খড় গেল ভেসে
মাথুরের পালা বেঁধে কতবার ফাঁকা হল ঘর আর খড়....। *

নৌকা আচমকা কোথায় ধাক্কা খায় ! কে যেন বলে ওঠে,—অচিন্ত্যদা, নামুন ...।

২৩ সেপ্টেম্বর সকাল দশটা ; আমি, দীপা, অনেকে আমরা খোলা আকাশের নীচে,—না নীচে নয়, এ' মুহূর্তে আমাদের পায়ের তলায় সেই আজন্মের চেনা মাটি, তাতে স্পষ্ট মাটির রঙ—পেলবতামাখা, আর মাথার ওপর ভরসা, কলেজের পুরু ছাদ নিরাপদ আশ্রয়ের রঙে রাঙানো। বড় নীল সে, ঘন নীল !

মনের মধ্যে চাপা-ধরা গুমোট ধীরে ধীরে কেটে যায়। কেটে যেতে থাকে। আমি যেন ফিরে আসি আবার আমাতে। আসে লজ্জা, জাগে নিজের ওপর নিজেরই ধিক্কার। হঠাৎ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াই।....

স্থানীয় একটা কলেজ ও স্কুলে খোলা হয়েছে ছটো ত্রাণ-শিবির। অজস্র জলবন্দী মানুষ সেখানে প্রায় প্রতি মুহূর্তে এসে উঠছে। প্রতিটি মানব-মানবী জীবন্ত শোকের মূর্তি। মূর্তিমান দুর্দশা জল কেটে কেটে এখানে এসে উঠেছে যেন ডাঙায়—উচু দু'চরায়। আমি আর এক মুহূর্ত দেরী না করে প্রয়োজনীয় ভূমিকায় নেমে পড়ি। অবশ্য এতক্ষণ যে নিশ্চেষ্ট ছিলাম তা কিন্তু নয়। বাড়ি ছেড়ে আসার সময়ই বিপ্ররা কিছু গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সেরে নিয়েছিল, দরকারী কিছু পরামর্শও ওদের দিয়েছিলাম। কিন্তু বাড়ি ছেড়ে আসাতক মনের মধ্যে কিরকম যেন একটা ভারী পাথর কোথা থেকে এসে চেপে বসেছিল। সেই শৈশবে সাত-পুরুষের ভিটে মাটি ছেড়ে আসার সময় যে'রকম হয়েছিল। জানতাম এবার বাড়ি ছেড়ে যাওয়া সে'রকম কিছু নয়, তবু মনের মধ্যে জেগেছিল এ'রকম এক বুক-দুমড়ানো হতাশতা, তার আচ্ছন্নতা বহুক্ষণ আমার মধ্যে গিয়েছিল থেকে।

বিপ্রর দেখা পেয়েছিলাম ঐ যে সেই সকালবেলায়। স্নিগ্ধার দেখা, কই না, সকাল থেকে তো ও একবার-ও চোখে পড়ে নি! স্নিগ্ধা ছুপুর বেলা এলো। কত ঝড়-তুফান বুঝি পেরিয়ে এলো সে। খবর দিল আমাদের অঞ্চলের পেছন দিকটায় 'রেসক্যুয়িং'য়ে সেনা বাহিনী নেমেছে। থানা থেকে ব্যবস্থা করা হয়েছে আরো কয়েকটা দেশী নৌকার। স্নিগ্ধার কাছেই খবর পেলাম, গত রাতে যখন বৃষ্টি জোর থেকে জোরদার হয়ে নামছে তখনই বিপ্র নাকি আঁচ করতে পেরেছিল, ভাব-গতিক মোটেই ভালো নয়। সে নাকি সেই

ঝড়-জল উপেক্ষা করে প্রভাতী সংঘের কর্মক্ষম প্রায় সকলের বাড়ি বাড়ি গিয়েছিল। আমার বাড়িতেও নাকি আসত। বাড়িটা তু' তুটো গলি পেরিয়ে ঢুকতে হয়। এ' ছাড়া বৃষ্টির মাত্রা ক্রমশ বাড়ছিল। ওরা ওর মধ্যেই চলে এসেছিল যে যার বাড়ি ছেড়ে প্রথমে ক্লাবে, বুঝতে পেরেছিল বৃষ্টি থামলেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে ত্রাণের কাজে। সুযোগ বুঝে বুদ্ধি করে চলে এসেছিল উঁচু রাস্তার ধারে কলেজে। সেখান থেকে সকালে বিপ্র গেছে নৌকো যোগাড় করতে। যে যা জোটাতে পেরেছে—গাড়ীর টায়ার, কলা-গাছ কেটে ভেলা বা মান্দাস, বৃষ্টি ধরার সঙ্গে সঙ্গে সে সব নিয়ে সবাই ঢুকেছে নিমজ্জিত পাড়ায় পাড়ায়। স্নিগ্ধা সকালবেলা চলে গিয়েছিল থানায়.... ।

এক নিঃশ্বাসে এত কথা বলে স্নিগ্ধা হঠাৎ থামে। বুঝি সে হাঁপাতে থাকে। আচমকা স্নিগ্ধা ঝরঝর করে কাঁদতে কাঁদতে গভীর আবেগে আমাকে এ' কি কথা শোনায়! আমি উত্তেজনায় স্নিগ্ধাকে নাড়া দিয়ে প্রায় চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করি,—কি বলছো.... সত্যি ?—সত্যি ? ...

স্নিগ্ধা যেন কথা বলতে পারে না। আমি স্পষ্ট শুনি, ও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে মুখে আঁচল ঢেকে কাঁদছে ; এক সময় কান্না চুপ। চোখ মুছে তারপর ও মুখ তোলে, তাকায়, চোখে কি অপূর্ব প্রসন্নতা—জয়ের জ্যোৎস্নারূপ। আমাকে চমকিত করে বলে চলে,—থানা থেকে অঞ্চলের ভয়াবহতার কথা বলে বেরুচ্ছি, ঠিক ছিল ওখান থেকে যাবো আমাদের এম, এল, এ-র কাছে, দ্রুত হেঁটে ট্রার্ণিংটা ঘুরছি একটা চায়ের দোকানের পাশ থেকে জোরালো ডাক ভেসে এলো—জয়া,.... ।

পেছনে ফিরে তাকাই। দেখি এগিয়ে আসছে আমার দিকে লক্কা ; নিজেই এগিয়ে এসে বলে,—আমাদের ও-দিকের খবর

কি? এমনিতেই আমাদের ওখানে একটু বৃষ্টি হলে জল জমে, এ'দুদিনের বৃষ্টিতে ও'সব জায়গা কি আর আছে?

—হ্যাঁ, সাংঘাতিক অবস্থা! আমি থানায় সব খবর দিয়ে গেলাম। আসার সময় সব দেখে আসতে পারি নি, তবে নিশ্চিত ও-সব-জায়গা বুঝি আর নেই, সব তলিয়ে গেছে। এখন যাচ্ছি....।

—চলো....আমিও যাবো।

—কোথায়?

—তোমার সঙ্গে। তোমাদের সঙ্গে। ....প্রায়শ্চিত্ত করতে ।

স্নিগ্ধা কথা বলতে বলতে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়। মুখে একটা হাসির আভা ছড়িয়ে তারপর একসময় বলে ওঠে—আপনিতো এ' দিকটাতে আছেন-ই। আমি স্কুলটা থেকে খবর নিয়ে আসি, খাবার-দাবাড় কিছু এসে পৌছালো কিনা?

—আমিও যাবো। চলো....! চলা শুরু করে জিজ্ঞেস করি,—লঙ্কা কোথায়?

স্নিগ্ধা উত্তর দেয়,—বিপ্র আর ও নৌকা বাইতে বাইতে গেছে বস্তীর দিকটায়....

আমি সে' দিকটায় দিগন্তের দিকে তাকাই। তল্লাসী করে খুঁজি নৌকাটা দেখা যাচ্ছে কি? দেখা যায়? খুঁজি,—দৃষ্টি উজাড় করে খুঁজি খুঁজে চলি.......

"নোয়ার নৌকো। নোয়াকে মনে পড়ে?
একদিন যে বাঁচায় জাগতিক যত প্রাণ,
জোড়ে জোড়ে—বিনষ্টির গ্রাস থেকে সৃষ্টিকে।

সেই সময় আবার আসছে, এসেছে। এই ঘাটে
নেই কোনও ঈশ্বর পাটনী, কই, দেখি না তো!
কোথায় সে, কিংবা তার তরী?
দেখি না। নোয়াকেও না। না-ই পাই,
তার নৌকোটাকে খুঁজে যাব। ছই-ছাওয়া
পাটাতনে বিশ্বাস আর বাসনা, এই দুটি
ভাই আর বোন—তুলে নেব।" * *

আমি স্নিগ্ধার সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে টের পাই, কারো পায়ে শেকল নেই,.......আমাদের কারো বুকে – হাতে বা পায়ে জল-শৃঙ্খল।

—

উদ্ধৃতি * জীবনানন্দ দাস * * সন্তোষ কুমার ঘোষ